শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ময়নাগড়ের বৃত্তান্ত

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
ময়নাগড়ের বৃত্তান্ত

ময়নাগড়ের বৃত্তান্ত

শীষে..ু মুখোপাধ্যায়

ময়নাগড়ের বৃত্তান্ত

পত্র ভারতী

www.bookspatrabharati.com

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১
দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২
তৃতীয় মুদ্রণ মে ২০১৩

MOYNAGARER BRITTANTO
by
Shirshendu Mukhopadhyay

ISBN 978-81-8374-097-5

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সুদীপ্ত দত্ত

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
e-mail patrabharati@gmail.com
visit us at www.facebook.com/ Patra Bharati
website www.bookspatrabharati.com

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস,
১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

''রা-স্বা''

বন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম

শ্রীমতী সুদেষ্ণা বসু

শ্রী শৈবাল মিত্র

করকমলেষু

'বৃত্তান্ত'-কথা

''ময়নাগড়ের বৃত্তান্ত'' ভিন্ন নামে আনন্দমেলায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে। নানা কারণে উপন্যাসটি আমি প্রকাশ করতে অনুমতি দিইনি কাউকেই। মনে হয়েছিল, বেশ কিছু পরিবর্তন করা দরকার। এখন দেখছি, সংস্কার করতে হলে পুরো উপন্যাসটিই নতুন করে লিখতে হয়। আর তাই যদি হয় তাহলে পুরোনো উপন্যাসটি তার মূল রূপে প্রকাশ পেলে ক্ষতি কিছু নেই। ময়নাগড়ের বৃত্তান্ত তাই দু-হাজার এগারোর কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হল। এর জটিল কাহিনি ও বিস্তার কার কেমন লাগবে, কে জানে!

৩০ ডিসেম্বর ২০১০ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পত্র ভারতী প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

পাঁচটি উপন্যাস

শীর্ষেন্দুর সেরা ১০১

ভৌতিক গল্পসমগ্র

রূপ মারীচ রহস্য

শীষে..ু মুখোপাধ্যায়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ২ নভেম্বর, ১৯৩৫, ময়মনসিংহ-এ। শৈশব কেটেছে নানা জায়গায়। পিতা রেলের চাকুরে। সেই সূত্রে এক যাযাবর জীবন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায়। এরপর বিহার, উত্তরবাংলা, পূর্ববাংলা, আসাম। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় কুচবিহার। মিশনারি স্কুল ও বোর্ডিং-এর জীবন। ভিকটোরিয়া কলেজ থেকে আই. এ.। কলকাতার কলেজ থেকে বি. এ.। স্নাতকোত্তর পড়াশোনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথম উপন্যাস 'ঘুণপোকা'। প্রথম কিশোর উপন্যাস—'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'। কিশোর সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিরূপে ১৯৮৫ সালে পেয়েছেন বিদ্যাসাগর পুরস্কার। পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার ও ১৯৮৯ সালের সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার।

পত্র ভারতী প্রকাশিত বই ময়নাগড়ের বৃত্তান্ত, শীর্ষেন্দুর সেরা ১০১, রূপ- মারীচ রহস্য, ভৌতিক গল্প সমগ্র এবং পাঁচটি উপন্যাস।

প্রচ্ছদ সুদীপ্ত দত্ত

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ময়নাগড়ের বৃত্তান্ত

নিরিবিলি ছোট্ট গঞ্জ-শহর ময়নাগড়। সকাল-বিকেল-সন্ধে গড়িয়ে যায় একই ছন্দে।

হঠাৎ ময়নাগড়ে নানারকম ঘটনা ঘটতে শুরু করল। ভূতের এবং বাঘের প্রাদুর্ভাব দেখা দিল। অনেক-অনেকে অচেনা মানুষজনকে দেখা গেল ময়নাগড়ে। কেউ জটাজুটধারী সন্ন্যাসী, কেউ চোর, কেউ ম্যাজিসিয়ান, কেউ আবার পৃথিবীর লোকই নয়। ভিনগ্রহের বাসিন্দা!

সাধাসিধে বোকাসোকা পাঁচু, নতুন মাস্টার শিবেন, পরিচিত চোর টকাই...সকলেই জড়িয়ে পড়ল অদ্ভুত সব ঘটনায়। তারপর?...

মরতে-মরতে কে বাঁচাল পাঁচুকে? টকাই কি জিততে পারল?...শিবেন মাস্টার কি ফেরত পেল তার থিসিস্ট?...

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কলমে 'অদ্ভুতুড়ে' মজার উপন্যাস।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ময়নাগড়ের বৃত্তান্ত

সূচি

.পৌষ মাসের এই সকালবেলায় ময়নাগড়ে অখণ্ড শান্তি বিরাজ করছে। রোদ এখনও ভালো করে ওঠেনি, চারদিকে বেশ জম্পেশ কুয়াশাও জমে আছে। রাঙা রোদ অবশ্য কুয়াশাকে হুড়ো দিয়ে তাড়ানোর প্রাণপণ চেষ্টা করছে। তাই একটু-একটু রাঙা আলো ফুটে উঠছে চারধারে। আর সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে পশুপতিবাবু তাঁর বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁতন করছেন। এই দাঁতন করার সময়টায় তাঁর মুখে একটা স্বর্গীয় আনন্দ ফুটে ওঠে। তিনি লোককে প্রায়ই বলেন, 'দাঁতন করার সময় আমার ভারী একটা দিব্যভাব আসে। মনে হয় যেন বাতাসের উপর হাঁটছি, অনেক অলৌকিক দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি, অনেক অলৌকিক শব্দ শুনতে পাচ্ছি।'

একটু পশ্চিমধারে নিজেদের বাড়ির উঠোনে গদাধর এইমাত্র পাঁচশো ডন শেষ করে পাঁচশো বৈঠক দিতে শুরু করেছে। তার হুপহাপ শব্দে বাতাস কাঁপছে। গদাধরও বলে, ডন-বৈঠক-মুগুর ভাঁজার সময় সে নাকি আর গদাধর থাকে না। তার শরীরে নাকি অন্য কিছু একটার ভর হয়। বাহ্য চৈতন্য থাকে না বলেই বোধহয় মাসখানেক আগে এক ভোরবেলায় চোর এসে তার সাইকেলখানা চোখের উপর দিয়েই চুরি করে নিয়ে গেল। গদাধর দেখেও দেখতে পায়নি।

থানার সেপাই রামশরণ হনুমানজির মন্দিরে পুজো চড়িয়ে ভজন গাইছে। মন্দিরটা অবশ্য একেবারেই বেঁটে বক্কেশর। মাত্র হাততিনেক উঁচু, বড়জোর দু-হাত লম্বা আর আড়াই হাত চওড়া। ভিতরে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ একটা মূর্তিও আছে। তবে তেল-সিঁদুর, শ্যাওলা আর ময়লায় মূর্তির মুখ-চোখ কিছু বোঝবার উপায় নেই। কিন্তু রামশরণ রোজ সকালে বিভোর হয়ে বেসুরো গলায় ভজন গেয়ে তার ভক্তি নিবেদন করে। হনুমানজির উপর তার ভক্তির কারণ আছে। সময়টা রামশরণের খারাপ যাচ্ছে। তার মোষটাকে নিধুবাবু খোঁয়াড়ে দিয়েছেন, তার ছেলে শিউশরণ এবার নিয়ে তিনবার ক্লাস সিক্সে ফেল মেরেছে। হেড কনস্টেবল হরিপদ সামনের মাসে রিটায়ার হওয়ার পর ওই পোস্টে রামশরণের যাওয়ার কথা, কিন্তু শোনা যাচ্ছে, ষষ্ঠীচরণকেই নাকি ওই পোস্টে বড়বাবু রেকমেন্ড করেছেন।

জীবনের উপর ঘেন্না ধরে যাওয়ায় পাঁচু কয়েকবারই অন্য মানুষ হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। তাতে যে একটুআধটু কাজ হয়নি তাও নয়। পুরোনো পাঁচু কিছুতেই তার পাছু ছাড়ে না। সে হয়তো একদিন সকালে ঠিক করল, আজ থেকে সে নন্দগোপাল হয়ে যাবে। ব্যস, সেদিন সকাল থেকেই সে প্রাণপণে নন্দগোপাল হতে চেষ্টা করতে লাগল।

তবে নন্দগোপাল হওয়া খুব সোজা কাজ তো নয়। নন্দগোপাল হচ্ছে ভারী বিনয়ী লোক। এত বিনয়ী যে, যার সঙ্গেই দেখা হয় তাকেই হাত কচলে, গ্যালগ্যালে হেসে

বিনয়বচন আওড়াতে থাকে, 'আমি আপনার পায়ের ধুলোরও যুগ্যি নই, আপনার গোয়ালের গোরুটার চেয়েও আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবেন, আপনার বাড়ির পাপোষটার মর্যাদাও আমার চেয়ে বেশি, বড় হতভাগা আমি, বড়ই অকিঞ্চন, মাঝে-মাঝে আমাকে জুতোপেটা করবেন তো ভাই!'

তা পাঁচুও ওইসব বলে বেড়াতে লাগল। একদিন নরহরি ঘোষ তার বিনয়বচন খুব মন দিয়ে শুনে বলল, 'হ্যাঁ রে পাঁচু, নন্দগোপাল কি মারা গেছে? কই, মারা গিয়ে থাকলে তার শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন পেলুম না তো!'

জিভ কেটে পাঁচু বলে, 'না না, ছিঃ ছিঃ, তিনি মরবেন কেন?'

নরহরি তখন ভাবিত হয়ে বলে, 'না মরলে তার ভূত তোর ঘাড়ে ভর করল কি করে? বিজ্ঞান তো শিখলি না। বিজ্ঞানে পরিষ্কার বলা আছে, কেউ না মরলে ভূত হওয়ার জো নেই। জ্যান্ত মানুষের ভূত বলে বিজ্ঞান কিছু স্বীকারও করে না কিনা! অথচ দেখছি নন্দগোপালের ভূত দিব্যি তোর ঘাড়ে চেপে বসে ঠ্যাং দোলাচ্ছে।'

পাঁচু মাথা চুলকে বলল, 'ভূত-প্রেতের ব্যাপার নয় আজ্ঞে। নন্দগোপালবাবু বড্ড ভালো লোক তো, তাই একটু সেরকম হওয়ার চেষ্টা করছিলাম আর কি।'

'রাম রাম। নন্দগোপাল হতে চায় আহাম্মকেরা। সবসময় গ্যালগ্যালে ভাব নিয়ে থাকলে কেউ পোঁছে না। দেখিস না, নন্দ রাস্তায় বেরোলে পাড়ার ছেলেরা ওর পিছনে লাগে, হাততালি দিয়ে ছড়া কেটে খ্যাপায়। যদি মানুষের মতো মানুষ হতে চাস, তবে আমার মতো হ। লোকে আমাকে বিশ্বনিন্দুক বলে বটে, আসলে আমি মানুষের দোষ মোটে সইতে পারি না। লোকে আমাকে তো ঝগড়ুটেও বলে, আসলে কি আমি তাই? তবে হ্যাঁ, আমি উচিত কথা বলতেও কাউকে ছাড়ি না। লোকে আমাকে হিংসে করে কিপটেও তো বলে! তাই বলে কি আমি কিপটে হয়ে গেছি নাকি? এই তো আজ সকালেই ফুটকড়াই দিয়ে জলখাবার খেয়েছি। মিতব্যায়ী আর কৃপণ কি এক হল? সবদিক বিচার করে দেখেছি রে বাপু, আমার মতো লোক হয় না।'

'যে আজ্ঞে!'

মুখে যাই বলুক, পাঁচু নরহরি ঘোষ হওয়ার চেষ্টা করেনি। নরহরির নাম নিলে নাকি হাঁড়ি ফাটে। তবে কিছুদিন পাঁচু শ্রীপদ হওয়ার চেষ্টা করেছিল বটে। শ্রীপদ হল গাঁয়ের লিডার, সবাই তাকে ভারী খাতির করে। বক্তৃতায় তার খুব নামডাক। শ্রীপদর জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনে লোকের রক্ত গরম হয়ে ওঠে, মাথায় খুন চেপে যায়, আস্তিন গুটোতে থাকে। তার আবেগপূর্ণ ভাষণে লোকে ভেউ-ভেউ করে কাঁদে। দেশের অধঃপতন নিয়ে তার

বক্তৃতার সময় সভায় সমবেত ছিঃ ছিঃ শোনা যায়। শ্রীপদর মুখ সর্বদাই গম্ভীর এবং চিন্তাকুল। এলেবেলে লোকের সঙ্গে সে কথাই কয় না। নিতান্ত মান্যগণ্যদের সঙ্গেও সে বেশ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথা কয়। সবাই বলে, শ্রীপদর নাকি খুব ব্যক্তিত্ব। পায়জামা আর গেরুয়া পাঞ্জাবি পরা শ্রীপদ কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ নিয়ে যখন রাস্তায় বেরোয়, তখন সর্বদাই তার সঙ্গে পনেরো-বিশজন মোসাহেব হেঁ-হেঁ করতে-করতে পিছু নেয়। দৃশ্যটা দেখলেই বুক ভরে যায়।

তবে অসুবিধেও আছে। পাঁচুর পায়জামা আর পাঞ্জাবি নেই, মোসাহেবও নেই। বক্তৃতাও সে কস্মিনকালে করেনি। তবে শ্রীপদ হওয়ার জন্য সে নির্জন মাঠে-ঘাটে গিয়ে একা-একাই বক্তৃতা প্র্যাকটিস করতে লাগল। কাজ শক্ত নয়, কিছু-কিছু কথা শোনাই ছিল।

তারপর পাশের গাঁ বৃন্দাবনঘাঁটিতে হাটবারে গিয়ে জনসমক্ষে তেলেভাজাওয়ালা বিরিঞ্চিপদর নড়বড়ে টুলটার উপর দাঁড়িয়ে ঠিক শ্রীপদর মতো গলা করে 'বন্ধুগণ...' বলে বক্তৃতা শুরু করে দিল। বক্তৃতা হচ্ছে শুনে অনেকেই বিকিকিনি থামিয়ে ভিড়ও করে ফেলল বেশ। পাঁচু দেশের দুর্নীতি, দুর্গতি, অবনতি নিয়ে বেশ গড়গড় করে বলে যাচ্ছিল বটে। কিন্তু সভায় একটু হাসি আর হুল্লোড়ও শোনা যাচ্ছিল। তার কারণ, পাঁচুর পরনে নীল রঙের হাফপ্যান্ট আর গায়ে খাকি রঙের সেই পুরোনো শার্টখানা।

তা প্রথমবার আধঘণ্টাটাক বলেছিল বটে পাঁচু। বক্তৃতার শেষটায় একটু গন্ডগোল হল। বিরিঞ্চিপদ তাকে হাত ধরে টেনে নামিয়ে নিজের টুলখানা নিয়ে যাওয়ায় ভারী অপ্রস্তুত হল পাঁচু। তবে লোকে যথারীতি হাততালি দিয়েছিল। আর আদর্শ বিদ্যাপীঠের বাংলার মাস্টারমশাই বলাইবাবু এসে বললেন, 'ওরে, বক্তিমে তো দিলি, কিন্তু তোর যে ব্যাকরণের জ্ঞানই নেই। একান্নটা ভুল শব্দ বলেছিস, ক্রিয়াপদ আর উচ্চারণের দোষ ধরলে তো অগুনতি!'

তা দু-চারটে এরকম ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও তার প্রথম বক্তৃতাটা যে উতরে গেছে তা ভেবে পাঁচু বেশ খুশিই হল। এরকম কয়েকবার প্র্যাকটিস করলেই পাঁচুকে নিয়ে হইচই পড়ে যাবে। তখন আর পাঁচুকে পায় কে?

কিন্তু কপালটাই তার খারাপ। পরদিনই দুপুরবেলায় শ্রীপদর দুই চেলা মাধব আর কেলো এসে তাকে ধরল, 'অ্যাই, তুই নাকি বৃন্দাবনঘাঁটিতে হাটের মাঝখানে শ্রীপদদাকে ভেঙিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিস? অ্যাঁ, শ্রীপদদাকে নিয়ে ক্যারিকেচার! এত বড় সাহস!'

তারপর সে কি মার রে বাপ! সারা শরীরে যেন একেবারে তবলালহরা বাজিয়ে গেল। মারের চোটে দিনসাতেক বিছানায় পড়ে থাকতে হল তাকে, তার ঘাড় থেকে শ্রীপদর ভূতও নেমে গিয়েছিল।

ইদানীং সে মন্মথ ভট্টাচার্য হওয়ার চেষ্টায় আছে। মন্মথবাবু অবশ্য বিদ্বান মানুষ। বিপিনচন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুলের হেডস্যার ছিলেন। সোজা সটান চেহারা, দিব্যি স্বাস্থ্য, গম্ভীর, কম কথার মানুষ, সবাই তাঁকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি করে। গাঁয়ে কোনও সভাসমিতি হলে মন্মথবাবু বাঁধা সভাপতি। রবীন্দ্রজয়ন্তী, নজরুলজয়ন্তী, কিংবা রবীন্দ্র-নজরুলজয়ন্তী কিংবা রবীন্দ্র-নজরুল-ক্ষুদিরাম-নেতাজিসন্ধ্যা, রক্তদান শিবির, শারদীয়া দুর্গোৎসবের শুভ উদ্বোধন কিংবা দ্বারোদঘাটনে মন্মথবাবুকে ছাড়া ভাবাই যায় না। তবে মন্মথবাবুর বক্তৃতাগুলো সাপটে ওঠা কঠিন। মরমী কবি রবীন্দ্রনাথ, বিদ্রোহী কবি নজরুল, ক্ষুদিরামের আত্মদান, নেতাজির অন্তর্ধান, এসব বিষয়ে পাঁচুর তেমন ভাবটাব আসে না। তাই ও চেষ্টা সে করেনি। আপাতত সে শুধু সকাল আর বিকেলে মন্মথবাবুর প্রাতর্ভ্রমণ আর সান্ধ্যভ্রমণটি নকল করার চেষ্টা করছে। মন্মথবাবুর ডান হাতে রুপোর বাঁধানো লাঠি, বাঁ-হাতে ধুতির কোঁচা, গায়ে গলাবন্ধ কোট, পায়ে মোজা আর পাম্পশু। ঘাড় উঁচু, পিঠ সোজা। হাঁটেন যেন গুলতি থেকে ছিটকে-যাওয়া গুড়ু:লের মতো। এই এখন আছেন তো পরক্ষণেই ওই হোথা চলে গেছেন। ক'দিন ধরে মন্মথবাবুর পিছু নিয়ে হাঁটতে গিয়ে হেঁদিয়ে পড়েছে পাঁচু। তাও ভাগ্যিস, হাফপ্যান্টের কোঁচা হয় না, আর লাঠিও পাঁচু এখনও জোগাড় করে উঠতে পারেনি, পাম্পশুও তার নেই, তার পায়ে ছেঁড়া হাওয়াই চপ্পল।

এই সাতসকালে মন্মথবাবুর পিছু নিয়ে একটু দূর থেকে পাঁচু প্রায় দৌড়পায়ে আসছিল। বজরঙ্গবলীর মন্দির অবধি এসে আর পারল না। হ্যা-হ্যা করে হাঁফাতে লাগল। উদ্ধববাবু সেই অন্ধকার থাকতে সাতসকালে বাজার করতে বেরিয়েছেন। অত সকালে না বেরোলে তাঁর বাজারে পৌঁছতে বড্ড দেরি হয়ে যায়। এই সকালে বেরিয়েও বেলা বারোটার আগে প্রায় কোনওদিনই বাজারে পৌঁছতে পারেন না। বাজার যে তাঁর বাড়ি থেকে অনেক দূর তাও নয়। বিষ্ণুপদ কানুনগো মেপে দেখেছেন উদ্ধববাবুর বাড়ি থেকে বাজারের দূরত্ব মোট সাতশো সত্তর গজ। অর্থাৎ আধ মাইলের মতো। তবু যে ভোর সাড়েচারটেয় বেরিয়ে তিনি বেলা বারোটা নাগাদ বাজারে পৌঁছন, তার কারণ হল, রাস্তায় যত লোকের সঙ্গে দেখা হয়, দুপাশে যত বাড়ি আছে সকলেরই কুশল সংবাদ নেওয়া, নানা বিষয়ে দু-চারটে কথা কওয়া, কোন-কোন গাছে কেমন ফুল বা ফল হচ্ছে তার খতেন নেওয়া, নেড়ি কুকুর, হুলো বেড়াল, পোষা পাখিদের সম্পর্কেও খোঁজখবর করা তো আছেই। তা ছাড়া, কখনও হয়তো বিদ্যাচরণের সঙ্গে একহাত দাবা খেলে নিলেন, হাই স্কুলের মাঠে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে দেখে মাঠে নেমে একটু খাটান দিলেন, মহেশগয়লা

দুধ দুইছে দেখে দাঁড়িয়ে খানিক দুধের ফেনার শুভ্রতা দেখে মুগ্ধ হলেন, আর এইসব করতে গিয়েই দেরিটা হয়ে যায়। তাঁর বউ বলে-বলে হয়রান হয়ে এখন অন্য বন্দোবস্ত করেছেন। বাজারের ব্যাপারিরা মাছ আর আনাজ তাঁদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে পয়সা নিয়ে যায়। উদ্ধববাবু বাজার না করলেও বাড়ির চলে যায়। কিন্তু বাজার না করে উদ্ধববাবু মোটেই থাকতে পারেন না, তা হলে বড্ড আইঢাই হয়।

আজও উদ্ধববাবু সাতসকালেই বেরিয়েছেন বটে। সাড়েচারটেয় বেরিয়ে এই সকাল ছ'টা নাগাদ বাড়ি থেকে মোট একশো গজ আসতে পেরেছেন। সাতজনের সঙ্গে কুশল বিনিময় হয়েছে, পরেশবাবুর বাড়িতে চা আর বিস্কুট খেয়েছেন। নরেশবাবুর বাড়িতে চারখানা নারকেলের নাড়ু আর জল, খগেনবাবুর বাড়িতে মাখন-টোস্ট দিয়ে এক কাপ কফি আর রমেশবাবুর বাড়িতে দু-গেলাস খেজুরের রস। আরও হবে, পথ এখনও মেলা বাকি।

সাতুবাবুর লাল গাইটার কাল পেট খারাপ করেছিল। তারও একটু খোঁজখবর নিতে গিয়েছিলেন উদ্ধববাবু। দেখলেন, গাই ভালো আছে। সাতুবাবু সেই গোরুর এক গেলাস দুধও খাওয়ালেন তাঁকে। দুধ খেয়ে তেঁতুলতলার পথ ধরে বড় সড়কের দিকে এগোচ্ছিলেন উদ্ধববাবু। সকালবেলায় আজ খাওয়াদাওয়াটা বেশ হয়েছে। মনটা খুশি-খুশি লাগছে। তেঁতুলতলার পথটা ভারী নির্জন আর জংলা, রাস্তা বলতে একটা সরু মেটে পথ, দু-ধারে আগাছা আর কাঁটাঝোপের জঙ্গল। দুটো কয়েতবেলের গাছ আছে বাঁ ধারটায়। ক'দিন আগেও দেখেছেন প্রচুর কচি কয়েতবেল ফলেছে। এখন একটাও নেই। গাঁয়ের পাজি ছেলেগুলো ফলপাকুড় মোটে পাকতেই দেয় না। ধীরেসুস্থে চারদিক দেখতে-দেখতে, আর সকালবেলার মিঠে রাঙা রোদ আর চারদিককার দৃশ্যাবলী উপভোগ করতে-করতে উদ্ধববাবু সড়কের দিকে মোড় ঘুরেই দেখতে পেলেন, বটতলার ছায়ায় একটা ভারী ঢ্যাঙা লোক দাঁড়িয়ে আছে। পরনে একটা ঢোলা পাতলুন গোছের জিনিস, গায়ের কামিজটাও বেজায় ঢলঢলে। দুটোর রংই নীল। মাথায় একটা গোলমতো টুপিও আছে, তবে গায়ে গরম জামা নেই। উদ্ধববাবু লোকটাকে চিনতে পারলেন না। এরকম ঢ্যাঙা কোনও লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই।

তবে লোকটাকে দেখে খুশিই হলেন উদ্ধববাবু। নতুন লোকের সঙ্গে কথা কয়ে আরাম আছে। কত কী জানা যায়।

মুখোমুখি হতেই দেখতে পেলেন, লোকটা বেশ ফরসা, মুখ-চোখ বেশ ভালো, চিনেদের মতো ঝোলা গোঁফ আছে। আর ডান বগলে একটা বড়সড়ো পোঁটলা আর বাঁ-কাঁধ থেকে একটা ছোট ঢোলের মতো জিনিস দড়িতে ঝুলছে। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি নয়।

উদ্ধববাবু একগাল হেসে বললেন, 'এ গাঁয়ে নতুন বুঝি?'

ছোকরা একটু ফচকে হাসি হেসে বলল, 'তা একরকম নতুনই বলতে পারেন। তবে এককালে আমার ময়নাগড়ে যাতায়াত ছিল।'

'বটে! তা হলে তো তুমি এ গাঁয়ের পুরোনো লোকই বটে। বাবার নাম কী বলো তো? কোন পাড়ায় বাড়ি? কাদের ছেলে তুমি?'

ছোকরা তেমনই ফচকে হাসি হেসে বলল, 'আন্দাজ করুন তো!'

উদ্ধববাবু বললেন, 'দাঁড়াও বাপু, দাঁড়াও। মুখটা বড্ড চেনা-চেনা ঠেকছে! আচ্ছা, তুমি মদন পোদ্দারের ভাগ্নে নও তো? এইটুকুন দেখেছি। ছেলেবেলায় বড্ড বাঁদর ছিলে বাবা। গাছ বাওয়া, ফল-পাকুড় চুরি করা, ঢিল মারা, মারপিট করা, পড়াশুনোয় ফাঁকি, কোন গুণটা না ছিল তোমার! তবে আমি কিন্তু বরাবর মদনকে বলে এসেছি, 'ওরে মদন, যারা ছেলেবেলায় দুষ্টু থাকে, তারা বড় হয়ে কেষ্টবিষ্টু হয়ে দাঁড়ায়। দেখিস, এ ছেলে এলেবেলে নয়, জজ-ব্যারিস্টার না হয় ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হবেই।' তা বাপু, এখন কী করাটরা হয়?'

ছোকরা ভারী সপ্রসংশ চোখে উদ্ধববাবুকে আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বলল, 'আপনি তো সাংঘাতিক লোক মশাই! আমার সম্পর্কে আপনার অনুমান তো প্রায় মিলেই গেছে দেখছি! বাঃ!'

উদ্ধববাবু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললেন, 'মিলবে না! লোকে তো পঞ্চমুখে বলে, 'হ্যাঁ উদ্ধবের চোখ আছে বটে, একবার যা দেখে তা বিশ-পঁচিশ বছরেও ভুল হওয়ার জো নেই।'''

'তাই দেখছি।'

'তা মদনের বাড়িতে উঠেছ তো!'

'আজ্ঞে না।'

'কেন বলো তো! মামার সঙ্গে কি বনিবনা হচ্ছে না? নাকি মামি হুড়ো দিচ্ছে! মদনের বউটা অবশ্য একটু কুঁদুলে আছে।'

'মামার বাড়িতে যে উঠিনি তার কারণ আপনি ঠিকই ধরেছেন। বনিবনা নেই। আর মামির ব্যাপারেও বোধহয় আপনি খুব একটা ভুল বলেননি। তবে তৃতীয় আর-একটা কারণ আছে।'

উদ্ভববাবু সাগ্রহে গলাটা খাটো করে বললেন, 'কী কারণ বলো তো বাপু। ভয় নেই, আমি পাঁচকান করব না।'

'কথা দিলেন তো?'

'মা কালীর দিব্যি।'

'তা হলে চুপিচুপি বলি। কারণটা হল, মদন তপাদার আমার মামা নন।'

'অ্যাঁ! তবে যে মদন তোমাকে ভাগ্নে বলে পরিচয় দিত! সেটা কি তবে মিথ্যে কথা? কাজটা তো মোটেই ঠিক করেনি মদন!'

ছোকরা ফের একটা ফিচকে হাসি হেসে বলল, 'মদন তপাদারকে মোটেই বিশ্বাস করবেন না মশাই। যাকে-তাকে ভাগ্নে বলে চালিয়ে দেন।'

উদ্ধববাবু সাগ্রহে বললেন, 'আর কাকে ভাগ্নে বলে চালিয়েছে বলো তো!'

ছেলেটা ভালমানুষের মতো বলল, 'তা অবশ্য আমি জানি না। কারণ, আমি মদন তপাদারকে চিনি না, কস্মিনকালেও দেখিনি।'

উদ্ধববাবু চোখ বড়-বড় করে বললেন, 'দ্যাখোনি! অ, তা হলে তুমি মদনের সেই ভাগ্নে নও বোধহয়।'

'আজ্ঞে না। তবে আপনার অনুমান খুব কাছাকাছি গেছে। মদন তপাদার না হলেও আমি কারও-না-কারও ভাগ্নে তো বটে।'

'তা, সেটা আগে বলতে হয়। তবে তোমার মুখখানা বড় চেনা-চেনা ঠেকছে হে। কোথায় যেন দেখেছি! আচ্ছা, তুমি নিমাইচাঁদের সেই নিরুদ্দেশ নাতি শিবচাঁদ নও তো! আহা, শিবচাঁদ বড় ভালো ছেলে ছিল। সাত-পাঁচে নেই, সাত চড়ে রা কাড়ে না, সাত-সতেরোয় থাকে না, সাতকাহন গল্প ফেঁদে বসে না, সপ্তগ্রামে গলা তুলে চেঁচায় না, আর তাকেই কিনা সাতঘাটের জল খাইয়ে ছাড়লে সাতকড়ি সরখেল। কী না সরখেলের বাবাকেলে পকেটঘড়িটা চুরি গেছে। ওরে বাবা, ঘড়ি কার না চুরি যায়! দুনিয়ায় কি ঘড়িচোরের অভাব আছে! তা সাতকড়ির সন্দেহ গিয়ে পড়ল শিবচাঁদের উপর। কেন, না শিবচন্দ্র নাকি দুপুরে গোবর কুড়োতে এসে সাতকড়িকে টাইম জিগ্যেস করেছিল। সুতরাং সাতকড়ির মনে হয়েছে, ও ঘড়ি শিবু ছাড়া আর কেউ সরায়নি। থানা-পুলিশ করে শিবুকে কী হেনস্থাটাই করল সাতকড়ি। সেই দুঃখেই ছেলেটা বিবাগী হয়ে গিয়েছিল। যাক বাবা, এতদিন পর যে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছ, দেখেই ভারী আনন্দ হচ্ছে হে শিবু। তা আর কোনও চুরির মামলায় ফেঁসে যাওনি তো বাবা! দাদুর সঙ্গে দেখা করেছ তো! সেই নাক,

সেই মুখ, সেই চোখ, ঠিক আগের মতোই আছ বাবা শিবু। তবে সেই শিবু ছিল বেঁটে, তুমি একটু লম্বা। শিবুর গায়ের রং ছিল কালো, তুমি অবশ্য ফরসাই। শিবুর চুল ছিল সটান, তোমার টুপির ধার দিয়ে যা দেখছি তাতে চুল কোঁকড়া বলেই মনে হচ্ছে। তা হোক, তা হোক, অত ধরতে নেই। দু-চারটে জিনিস না মিললে তুমিই যে আমাদের শিবু তাতে সন্দেহের অবকাশই নেই।'

ছোকরা চোখ-নাক কুঁচকে বলল, 'এবারের অনুমানটাও বড্ড কাছাকাছি এসে গেছে মশাই। আপনার দেখার চোখ আছে বটে! দিব্যদৃষ্টি কি একেই বলে!'

'হেঁ-হেঁ, কী যে বলো শিবু। ওইটেই আমার দোষও বটে, গুণও বটে। মুখ দেখে পেটের কথা ধরে ফেলতে পারি বলেই অনেকে যেমন আমার সুখ্যাতি করে। তেমনই আবার কারও-কারও আঁতেও লাগে। এই তো সেদিন রামগোপাল বটতলায় মুখখানা শুকনো করে বসে ভাবছিল। আমি সটান গিয়ে তাকে বললুম, 'কী রে রেমো, তোর বউয়ের সঙ্গে আজ ঝগড়া হয়েছে তো!' রেমো তো অবাক। বলল, 'কী করে বুঝলেন দাদা! দিন, পায়ের ধুলো দিন।' তা হলে সব ঠিকঠাকই বলেছি তো শিবু? ভুল করিনি তো?'

ছোকরা সবেগে মাথা নেড়ে বলে, 'আজ্ঞে না, ভুল হওয়ার জো-ই নেই। শুনতে-শুনতে এখন তো নিজেকে আমার শিবু বলেই মনে হচ্ছে। নিজের গা থেকে আমি একটা শিবু-শিবু গন্ধও পাচ্ছি।'

উদ্ধববাবু হাঁ করে একটু চেয়ে থেকে বললেন, 'তা হলে কি তুমি বলতে চাও যে, তুমি শিবু নও? আপত্তি থাকলে আমি চাপাচাপি করব না। ঘড়িচোরের বদনাম ঘাড়ে নিয়ে শিবু হতে কারই বা ইচ্ছে থাকে। বলি, পরান মণ্ডলের মেজো ছেলে প্রাণকৃষ্ণ কি না জিগ্যেস করলেও তুমি হয়তো বলে বসবে, প্রাণকৃষ্ণকেও তুমি চেনো না। তা প্রাণকৃষ্ণ তো আর ঘড়ি চুরি করেনি। দোষের মধ্যে তার একটু থিয়েটার করার শখ ছিল। চেহারাখানাও বেশ নাদুসনুদুস। শেষে মুম্বই গিয়ে জুটেছিল সিনেমায় নামবে বলে। ইদিকে আমরা গাঁসুদ্ধু লোক সিনেমার পরদায় তার দেখা পাব বলে আশপাশের শহরে গিয়ে রাজ্যের হিন্দি সিনেমা দেখতে লাগলাম। কোনওটাতেই প্রাণকৃষ্ণ নেই। মুরগিহাটার কুশচন্দ্র অবশ্য বলেছিল, কোনও একটা সিনেমায় নাকি নারদের রোলে এক মিনিটের জন্য তাকে দেখিয়েছে। তবে নারদের যা বিচ্ছিরি দাড়িগোঁফ, তাতে কুশচন্দ্রের ভুলও হতে পারে।' ফরসাগঞ্জের ফটিক খুব জোর দিয়ে বলেছিল, সে নাকি প্রাণকৃষ্ণকে 'পিয়াস লাগি' ছবিতে একটা চাকরের পার্ট করতে দেখেছে। সিনেমায় প্রাণকৃষ্ণের নাম হয়েছে 'প্রাণকুমার'। কিন্তু ফটিক দিনেদুপুরে মিথ্যে কথা বলে। তা সে যাই হোক, প্রাণকৃষ্ণের কোনও খবর

সেই থেকে আর পাওয়া যায়নি। তোমাকে দেখে আমার খুব সন্দেহ হচ্ছে, আমাদের সেই প্রাণকৃষ্ণই ফিরে এল কি না! কী হে বাপু, শুনে যে মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেল! ওরে বাপু, ঘাবড়ানোর কী আছে? সত্যি কথাটা যদি বলেই ফ্যালো, তা হলে তো আর আমি লোককে বলে বেড়াব না। আমরাও তো জানি ফিল্মস্টারদের কত হ্যাপা সামলাতে হয়। অটোগ্রাফ দাও রে, সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁত কেলিয়ে ফোটো তোলো রে, এ পেন্নাম করে তো ও ছুঁয়ে দ্যাখে, রক্তমাংসের মানুষ কি না। তা বাপু, তোমার কোনও ভয় নেই, তুমি যে ফিল্মস্টার তা কাকপক্ষীতেও জানবে না। কথা দিচ্ছি। আমাদের সেই প্রাণকৃষ্ণ এত বড় কেউকেটা হয়েছে, এ তো তল্লাটের মস্ত গৌরব!'

ছেলেটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ধরে যখন ফেলেছেনই, তখন লুকিয়ে আর কী লাভ খুড়োমশাই। আপনার চোখকে ফাঁকি দেওয়ার এলেম আমার নেই। তবে কিনা আমাকে ফিল্মস্টার বলাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। প্রাণকৃষ্ণ বলুন, আপনি গুরুজন, মাথা পেতে মেনে নেব। কিন্তু ফিল্মস্টার বললে আসল ফিল্মস্টাররা ভারী অপমান বোধ করবেন!'

'বটে! তা হলে কি তুমি ফিল্মস্টার হতে পারোনি হে প্রাণকৃষ্ণ?'

'আজ্ঞে না।'

'কুলাঙ্গার! কুলাঙ্গার! আমরা হাপিত্যেশ করে এতকাল বসে রইলাম তোমাকে সিনেমায় দেখব বলে, তা সেটা পেরে উঠলে না? ছিঃ ছিঃ, লোকের কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে?'

'আজ্ঞে, সেই জন্যই তো আড়ালে আবডালে মুখ লুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

'অপদার্থ আর কাকে বলে! ওরে আহাম্মক, ফিল্মস্টার হতে কী এমন হাতিঘোড়া লাগে বল তো! ক্যামেরার সামনে একটু নাচগান, একটু ফাইট আর ডায়লগ হাঁকড়ে যাওয়া। এও পেরে উঠলে না?'

ছেলেটা ভারী কাঁচুমাচু হয়ে বলে, 'সবার কি সব হয় খুড়োমশাই? ফিল্মস্টার হতে পারিনি, প্রাণকৃষ্ণও হতে পারব কি না জানি না। প্রাণকৃষ্ণ হতে চাইলেই তো হবে না, প্রাণকৃষ্ণ এবং তার বাবা-মা, তস্য আত্মীস্বজন ও বন্ধুবান্ধবাদি নানারকম আপত্তি তুলতেই পারে। থানা-পুলিশ হওয়াও সম্ভব। ভেবে দেখুন, এত সব ফ্যাকড়ায় আপনিও জড়িয়ে পড়তে চান কি না।'

উদ্ধববাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'প্রাণকৃষ্ণ না হয় নাই হলে, তা বলে তুমি লোকটা আসলে কে, তাও তো জানা দরকার হে! গাঁয়ে একটা উটকো লোক হঠাৎ উদয়

হলে চারদিকে একটা কানাকানি, ফিসফাস শুরু হবে না? চাই কী, দাঙ্গাহাঙ্গামাও বেধে যেতে পারে। এই তো বছরতিনেক আগে এক মস্ত জটাজুটধারী সাধু এসে থানা গেড়েছিল বটতলায়, সঙ্গে গুটিদুই চেলা। পরে শোনা গেল, সে নাকি স্পাই। দিনকাল তো ভাল নয় হে। তাই বলছি, ঝেড়ে কেশে ফ্যালো। তোমাকে আমার বড্ড চেনা-চেনা ঠেকছে কেন কে জানে!'

'জন্মান্তর মানেন খুড়োমশাই?'

'কেন বাপু, জন্মান্তর মানব না কেন? আমাদের রামহরি গুণ মস্ত তান্ত্রিক। ভৃগুর গণনায় একেবারে সিদ্ধবাক। কে আগের জন্মে কী ছিল, তা গড়গড় করে বলে দেয়। তোমাকে চুপিচুপি বলছি, কাউকে বোলো না, আমাদের মন্মথবাবু নাকি আগের জন্মে কুমির ছিলেন। আমার কেমন যেন আগে থাকতেই তা মনে হত। আমার সেজো ছেলে পল্টুকে যখন ক্লাস এইটে তিনবার ফেলে করিয়ে দিয়েছিলেন, তখনই আমার মন বলছিল, উনি কুমির না হয়ে যান না। কুমির নাগালে পেলে তোমাকে কিছুতেই ডাঙায় উঠতে দেবে না, ঠ্যাং কামড়ে হিড়হিড় করে জলে নামাবেই কি নামাবে। দিল আমার পল্টুকে ডাঙায় উঠতে? এই যে পশুপতিবাবুর কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা হাওলাত নিয়েছিলাম, চণ্ডীমণ্ডপে মাতব্বরদের সামনে কী অপমানটাই করলেন আমাকে। তা তিনি আগের জন্মে কী ছিলেন জানো? চুম্বক লোহা, চুম্বক লোহা আশপাশের সব জিনিস টেনে রাখে, উনিও তাই, ওয়ান পাইস ফাদার মাদার। তা বাপু, জন্মান্তরের কথাটা উঠছে কেন?'

ছোকরা মিষ্টি হেসে বলল, 'না ভাবছিলাম, আপনার সঙ্গে হয়তো আমার আগের জন্মে পরিচয় ছিল, তাই আমাকে আপনার এত চেনা-চেনা ঠেকছে।'

'উঁহু, তুমি আমাকে যত বোকা ঠাউরেছ, আমি তত বোকা নই হে। আমার স্মৃতিশক্তি অতি চমৎকার। এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও সতেরোর ঘরের নামতা বলে যেতে পারি।'

'ওরে বাবা, সে তো খুবই শক্ত কাজ খুড়োমশাই!'

'তাই তো বলছি হে, আমাকে ফাঁকি দেওয়া অত সোজা নয়।'

ছেলেটা আমতা-আমতা করে বলল, 'তাই তো! বড্ড মুশকিলে ফেললেন দেখছি!'

'কেন হে বাপু, নাম-ধাম-পরিচয় বলে ফেললেই তো হয়।'

'নামটা বড় গোলমেলে। ভাবছি, আপনার যদি বিশ্বাস না হয়, পিতৃদত্ত নাম, ফেলেও দিতে পারি না।'

'আহা, নাম কি কেউ ফেলে? ও কি ফেলার জিনিস? বাপ-পিতেমোর দেওয়া নাম পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বলতে হয়। নাও, বলে ফ্যালো, ফেললেই দেখবে ল্যাঠা চুকে যাবে।'

'আজ্ঞে না খুড়োমশাই, নতুন ল্যাঠাও উপস্থিত হতে পারে।'

'কেন হে বাপু, তোমার নামে কি হুলিয়া আছে?'

'বিচিত্র নয়। গুজব শুনেছি, অনেকে নাকি আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'ও বাবা! তা তুমি করেছটা কী?'

'সে বলতে গেলে মহাভারত। কাজ কী আপনার ওসব শুনে?'

'বলি চোর, ডাকাত বা খুনি নও তো?'

ছেলেটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সে হলেও তো ভাল ছিল খুড়োমশাই। আজকাল তো দেখতে পাই, চোর-ডাকাত-খুনিদের বেজায় নামডাক আর বোলবালাও। তারাই সব মুরুব্বি-মাতব্বর কেষ্টবিষ্টু হয়ে বসে আছে।'

'যা বলেছ বাবা, একেবারে প্রাণের কথাটি। এই যে আমাদের ময়নাগড়ের মাতব্বর মহাদেব বিশ্বাস, দেখলে মনে হবে দেশের দরদে প্রাণ উথলে উঠছে। বললে পেত্যয় যাবে না, আঠারোখানা খুনের মামলা ছিল ওর নামে। ওই যে বিষ্ণু সাঁতরা, গাঁয়ে উন্নতির নামে সরকারি যে টাকা আসে, তা ফাঁক করে তেতলা বাড়ি করে ফেলল চোখের সামনে। আরও শুনবে? রাত ভোর হয়ে যাবে কিন্তু!'

'আজ্ঞে, তবে থাক।'

'তা তোমার অপরাধটা কী?'

'আজ্ঞে, বললে বিশ্বাস যাবেন না, আমার অপরাধ হল, আমি ম্যাজিক দেখাই।'

'ম্যাজিক দেখাও, বটে? তা সে তো খুব ভালো জিনিস হে! তাতে দোষের কী?'

'সেইটেই তো বুঝতে পারছি না খুড়োমশাই। তবে অনেকেই আমাকে ভালো চোখে দেখে না।'

'না হে বাপু, এ বড় হেঁয়ালি ঠেকছে। ম্যাজিকের মধ্যে আবার গন্ডগোলটা কীসের? ম্যাজিক মানে তো হাতসাফাই আর একটু হিপনোটিজম। ও তো স্রেফ মজা ছাড়া কিছু নয়।'

'ওখানেই তো মুশকিল। আমার ম্যাজিকে অনেকে মজাটা খুঁজে পাচ্ছে না। তারা আমার গর্দান নেওয়ার জন হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'এটা তো খুব অন্যায় কথা হে!'

'আজ্ঞে, কলিযুগে ন্যায়টা আর দেখছেন কোথায় বলুন।'

'সেও ঠিক কথা। কিন্তু ম্যাজিশিয়ানের গর্দান কেন চাওয়া হচ্ছে সেটাই বুঝতে পারছি না। থাক গে, তোমার নামটা শুনি।'

'শুনে বিশ্বাস হবে তো আপনার?'

'খুব হবে, খুব হবে। আমার খুড়তুতো এক শ্যালক আছে, তার নাম পর্বত। আমার এক মাসতুতো দিদি আছে, তার নাম পেত্নি।'

'বাঃ, তবে তো আপনার অভ্যাস আছেই। আমার নাম হিজিবিজি।'

উদ্ধববাবু একটু হাঁ করে চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন, 'ঠিক শুনেছি তো বাপু? আমার কানের কোনও দোষ হয়নি তো!'

ভারী লাজুক মুখে ছেলেটা বলল, 'এতক্ষণ তো আপনার কান ঠিক মতোই কাজ করেছে, তাই না?'

'তা বটে।'

'দোষ নেবেন না খুড়োমশাই, আমি তো আগেই আপনাকে সাবধান করেছিলাম।'

উদ্ধববাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তা নামটাকে খারাপও বলা যাচ্ছে না, বেশ নতুন ধরনের নাম। তা বাপু হিজিবিজি, তুমি কি এই নামেই ম্যাজিক দেখাও? তোমার বাবা কি এই নামেই তোমাকে ডাকেন? যদি একদিন তোমার দেশজোড়া নাম হয় তখনও কি এই নামই বহাল থাকবে?'

'উপায় কী বলুন। এই নামেই যে সবাই আমাকে চেনে।'

'তা বাপু হিজিবিজি, তোমার বাবা এই মোক্ষম নামটা পেলেন কোথা থেকে?'

'শুনলে হাসবেন খুড়োমশাই, ছেলেবেলায় খুব দুষ্টু ছিলাম তো। সর্বদাই অকাজ-কুকাজ করে বেড়াতুম। বাবা আমাকে দেখিয়ে লোককে বলত, 'হি ইজ বিজি।' সেই থেকেই লোকে হিজিবিজি বলে ডাকতে শুরু করে। শেষে এই নামটাই আমার সঙ্গে সেঁটে গেল।'

উদ্ধববাবু ভারী খুশি হয়ে বললেন, 'এইবার বুঝলুম, বাঃ এই তো হিজিবিজি একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল। তা বাবা হিজিবিজি, তুমি কি ম্যাজিক দেখানোর মতলবেই ময়নাগড়ে এসে জুটেছ?'

মাথা নেড়ে একটু হেসে হিজিবিজি বলে, 'না খুড়োমশাই, ম্যাজিক আমার মাথায় উঠেছে। আমি এসেছি বিপদে পড়ে। গত সাতদিন ধরে এক জায়গায় দু'রাত্তির থাকতে পারিনি।'

'কেন বাপু, কেন?'

'চারদিকে আমার খোঁজ হচ্ছে যে!'

'কারা খুঁজছে তোমাকে? তারা কি খারাপ লোক?'

'সবাইকে খারাপ বলি কী করে বলুন! ধরুণ পুলিশ, মিলিটারি, ইন্টারপোল, আন্তর্জাতিক গুন্ডা কে না খুঁজছে আমাকে। সবাই তো আর খারাপ লোক নয়।'

'তা হলে গা-ঢাকা দিতে এসেছ নাকি? সে গুড়ে বালি। এখানে কারও পেটের কথা গোপন থাকে না। মাঝরাত্তিরে হয়তো তোমার কান কটকট করেছিল, সকালে উঠে দেখবে সারা তল্লাটে তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তোমাকে কী বলব বাবা, মা মরার সময় দশটা মোহর তার বাক্স থেকে বের করে আমাকে দিয়ে বলেছিল, 'সাবধানে লুকিয়ে রাখিস।' তা আমি নিশুতি রাতে সেই মোহর অন্ধকারে বসে বালিশের সেলাই খুলে তার মধ্যে ঢুকিয়ে ফের সেলাই করে দিই। আগাগোড়া অন্ধকারে কাজ করতে হয়েছিল, তাতে বারদশেক ছুঁচের খোঁচা খেতে হয়েছিল হাতে। এত সাবধান হওয়া সত্বেও পরদিন সাত্যকীবাবুর সঙ্গে দেখা হতেই গম্ভীর মুখে বললেন, 'মাসিমার দেওয়া মোহরগুলো বালিশে ভরে রাখা কি নিরাপদ হল মশাই?'

'আশ্চর্য তো!'

'এ আর আশ্চর্যের কী। বাজারের মাছওলা নিতাই একগাল হেসে বলল, 'উদ্ধববাবু, চোর তো বালিশটাই হাপিশ করে দেবে মোহরসুদ্ধু! না না, ও আপনার বড্ড কাঁচা কাজ হয়েছে।' সনাতন পাল বলল কী জানো? বলল, 'আহা ব্যালিশের বাঁ-কোণে যে মস্ত একটা ছেঁড়া জায়গা রয়েছে উদ্ধববাবু, লক্ষ করেননি? চুরি যদি নাও যায়, ফুটো দিয়ে পড়েও তো যেতে পারে।' তবেই বোঝো, ময়নাগড় কেমন জায়গা। এখানে লুকোছাপা ব্যাপারটাই নেই। সবাই সবাকার হাঁড়ির খবর জেনে যায়। আমার তো মনে হয় ময়নাগড়ের কুকুর, বেড়াল, পাখি-পক্ষী, পোকামাকড়, অবধি খবর ছড়িয়ে বেড়ায়।'

হিজিবিজি ভাবিত হয়ে বলল, 'তা হলে তো মুশকিল হল খুড়োমশাই!'

'তুমি বরং বৃন্দাবনঘাঁটি বা তালপুকুরে চেষ্টা করে দ্যাখো, এখানে সুবিধে হবে না।'

'আচ্ছা, তা হলে আসি খুড়োমশাই।'

'এসো গিয়ে।' বলেই উদ্ধববাবু হাঁ। গাছতলায় দাঁড়ানো হিজিবিজি একটুও নড়ল না, চড়ল না, দাঁড়িয়ে থেকেই যেন হঠাৎ বাতাসে মিলিয়ে গেল। ঘটনাটা এত তাড়াতাড়ি চোখের পলকে ঘটে গেল যে, উদ্ধববাবু ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বেকুবের মতো কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ 'ওরে বাবা রে! ভূত! ভূত! ভূ...' বলে চেঁচাতে-চেঁচাতে প্রাণপণে দৌড় লাগালেন।

দুই

ময়নাগড় বাজারের লোকজন ভারী অবাক হয়ে দেখল সকাল সোয়া সাতটায় উদ্ধববাবু হাঁফাতে-হাঁফাতে এসে বাজারে ঢুকছেন। কয়েকজন হাততালি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাল। স্কুলের ইংরেজির মাস্টারমশাই তাড়াতাড়ি কবজির ঘড়িটা কানে তুলে দেখলেন, সেটা বন্ধ হয়ে গেছে কিনা। জগদীশ হালুইকর তার জামাই গোপালকে ডেকে বলল, 'উদ্ধববাবুটা বোধহয় পাগলই হয়ে গেল রে!' গাঁয়ের বিখ্যাত দৌড়বীর পটল বলল, 'ওঃ, এই বয়সেও যা দৌড়টা দিলেন জেঠু, যৌবনে নিশ্চয়ই অলিম্পিকে গেলে মেডেল আনতেন।' উদ্ধববাবু রাজু দাসের দোকানের সামনে বেঞ্চে বসে হ্যা-হ্যা করে হাঁফাতে লাগলেন, কথা কওয়ার মতো অবস্থা নেই। শুধু তার মধ্যেই বারকয়েক 'হিজিবিজি... হিজিবিজি...ভূ...ভূত...' বলে হাল ছেড়ে দিলেন। রাজু তাড়াতাড়ি টিউবঅয়েল থেকে জল এনে এই শীতে তাঁর মাথায় থাবড়াতে লাগল।

নয়নপুরের জমিদার সিদ্ধেশ্বরবাবু বললেন, 'উদ্ধব কিছু একটা বলবার চেষ্টা করছে মনে হয়। কী বলছে বলো তো?'

রাজু বলল, 'উনি বলতে চাইছেন যে, উনি ভূত দেখেছেন। হিজিবিজি ভূত।'

সিদ্ধেশ্বর চিন্তিত গলায় বললেন, 'আহা, সকালবেলাটায় ভূত কোথা থেকে আসবে। এ-সময়ে তাদেরও বিষয়কর্ম, প্রাতঃকৃত্যাদি থাকে।'

নরহরি ঘোষ মাথা নেড়ে বলে, 'না মশাই, সায়েন্সে পরিষ্কার বলা আছে, ভূতেরা প্রাতঃকৃত্য, আচমন, স্নান, ভোজন এসব করে না। তবে সায়েন্সে বলা আছে, রোদ হচ্ছে

ভূতের সবচেয়ে বড় শত্রু। গায়ে রোদ পড়লেই ভূত গায়েব। কাজেই বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে উদ্ধববাবুর পক্ষে সকালবেলায় ভূত দেখা সম্ভব নয়।'

সিদ্ধেশ্বর বললেন, 'আহা, ও তো নিজেই বলছে ভূত নয়, হিজিবিজি দেখেছে।'

'হিজিবিজি নয় সিদ্ধেশ্বরবাবু, উদ্ধববাবু বলতে চাইছেন, ইজি, বি ইজি। অর্থাৎ সব ঠিক আছে, তোমরা স্বাভাবিক হও।'

পশুপতিবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'হল না হে, হল না। ইজি, বি ইজি মানে হল গিয়ে...দাঁড়াও বলছি, পেটে আসছে মুখে আসছে না...সে যাক গে, তবে রোদ উঠলে ভূত উবে যায় ও কথাটাও ঠিক নয়। শীতকালে জমাট নারকেল তেল যেমন রোদে রাখলে গলে যায়, তেমনই রোদে ভূতও গলতে থাকে!'

নরহরি ঘোঁষ খিঁচিয়ে উঠে বলল, 'বলি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের ফর্মুলা জানো?'

পশুপতিবাবু জানেন না, তাই তিনি শুকনো মুখে পিছিয়ে দাঁড়ালেন।

নরহরি বুক চিতিয়ে বলল, 'তা হলে ফটফট করতে আসো কেন?'

ব্যায়ামবীর গদাধর মাসল দেখানোর জন্য শীতেও হাফপ্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'উদ্ববাবু যে ভূত দেখেছেন তাতে সন্দেহ নেই। তেঁতুলতলার বেঁটে ভূতের কথা সবাই জানে। আর নরহরিবাবুকে বলি, রোদ লাগলে ভূত গায়েব, একথা যদি কেউ বলে থাকে, তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন তো, দুই রদ্দায় তার ঘাড় ভেঙে দেব। রোদে যদি ভূত গায়েব হয়ে যায়, তা হলে শাস্ত্রে কি মিথ্যে কথা বলেছে যে, ঠিক দুককুরবেলা ভূতে মারে ঢেলা!'

এ-কথায় বেশ জনসমর্থন পাওয়া গেল। নরহরি ঘোষ আর উচ্চবাচ্য করলেন না। কারণ, তিনি ব্যায়ামবীর গদাধরকে একটু সমঝে চলেন।

নিধুবাবু বলে উঠলেন, 'ও হো, তেঁতুলতলার বেঁটে ভূতের কথা বলছ তো! ও তো বক্কেশ্বর। তা বাপু, সত্যি কথা বললে বলতে হয়, বক্কেশ্বর ভারী নিরীহ, ভিতু আর লাজুক ভূত। জনসমক্ষে কখনও বেরোয় না। কেউ দেখে ফেললে লজ্জা পেয়ে, জিভ কেটে 'সরি' বলে সরে যায়।'

এক কেজি করলা কিনে গামছায় বেঁধে রামশরণ এসে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে সব কথা শুনছিল। সে বলল, 'হাঁ হাঁ, উ বাত ঠিক আছে। বকাসুর পিরেতকে আমি ভি চিনি। উ তো উমদা ভূত আছে। আমি তো উসকো খইনি ভি খিলায়েছি।'

এমন সময় চারদিকে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। দারোগা নীলমাধব রায় রোঁদে এসেছে। তাকে অবশ্য নিজের হাতে বাজার করতে হয় না। ব্যাপারিরাই তার বাড়িতে

মাছ, মাংস, সবজি, দুধ, ঘি, ডিম সব পৌঁছে দিয়ে আসে। তবে কর্তব্যবশে সে বাজারে এসে সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে যায়।

উদ্ধববাবুর খবর শুনে নীলমাধব দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে এল। তার বিশাল চেহারা। যেমন লম্বা, তেমনই চওড়া। তবে চেহারাটা বড় থলথলে। বাজখাঁই গলায় সে হাঁক দিল, 'এখানে শোরগোল কিসের? কী হয়েছে?' নীলমাধবের সঙ্গে দশ-বারোজন সেপাই। তারা লাঠি আনসাতে-আনসাতে ভিড় হঠিয়ে দিতে লাগল, 'হঠো, হঠো, বড়বাবুর আসবার সাস্তা করো।'

নীলমাধব সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী হয়েছে উদ্ধববাবু?'

উদ্ধববাবুর হাঁফটা একটু কমেছে। কাহিল মুখে বললেন, 'ওফ, খুব জোর প্রাণে বেঁচে গেছি বড়বাবু।'

নীলমাধব হাঁক মেরে বলল, 'ওরে ষষ্ঠীচরণ, নোটবই বের কর, জবানবন্দি নে। হ্যাঁ, এবার বেশ গুছিয়ে বলুন তো, ঠিক কী ঘটেছে।'

উদ্ধববাবু বেশ গুছিয়েই বললেন। ভূত হলেও হিজিবিজি যে অন্যান্য ভূতের মতো এলেবেলে ভূত নয়, সেটাও বুঝিয়ে ছাড়লেন।

নীলমাধব ভ্রূ কুঁচকে সব শুনল।

তারপর বলল, 'দেখুন, দিনের বেলায় আমি ভূতে বিশ্বাস করি না। তবে রাতের বেলায় অন্য কথা। যাই হোক, এখন আমি আপনার গল্পে বিশ্বাস করছি না। আমার মনে হচ্ছে আপনি একজন ডেনজারাস ক্রিমিনালের পাল্লায় পড়েছিলেন। সে মোটেই অদৃশ্য হয়ে যায়নি, গা ঢাকা দিয়েছে। হিজিবিজি তার আসল নাম হতে পারে না, ছদ্মনাম। এই ঘটনা থেকে মনে হচ্ছে, ময়নাগড় আর আগের মতো শান্তশিষ্ট জায়গাটি নেই। বিপদের কালো মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে।'

নীলমাধব তার সেপাইদের অকুস্থল মার্চ করার হুকুম দিল। তারপর বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে জলদগম্ভীর গলায় বলল, 'ভাইসব, বন্ধুগণ, প্রিয় দেশবাসী, মা, বোন, ভাইয়েরা, বয়োবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধা, নাবালক, নাবালিকা, যুবক ও যুবতীবৃন্দ, কমরেডগণ, আমার সহযোদ্ধা এবং সহমর্মীগণ, সংগ্রামী শ্রমিক, কৃষক, মজদুর, আপামর নগর ও ভারতবাসী, প্রবাসী ও অনাবাসী, সবাইকেই জানাই আমার বিপ্লবী ও সংগ্রামী অভিনন্দন। আপনারা হয়তো জানেন না। ময়নাগড়ের শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ, এই স্বপ্নিল ছবির মতো গ্রামে, যেখানে বারো মাসে তেরো পার্বণ, যেখানে গান গেয়ে বাউল নেচে বেড়ায়, যেখানে গান গেয়ে ধান কাটে চাষা, যেখানে পায়ের নীচে দূর্বা কোমল, মাথার উপর নীল

আকাশ, যেখানে গাছে-গাছে থরে বিথরে ফুল-ফল ধরে আছে, যেখানে গাঙের জলে ঝিলিমিলি ঢেউ খেলে যায়, মাঝির গলায় শোনা যায় ভাটিয়ালি গান, যেখানে খেতভরা ফসল, মরাই ভরা ধান, গোয়ালভরা গোরু, যেখানে মানুষের মুখে হাসি আর ধরে না, সেই ময়নাগড়ে বিপদের সংকেত এসে পৌঁছেছে। আপনারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ুন, চারদিকে নজর রাখুন, সন্দেহভাজন কাউকে দেখতে পেলেই থানায় খবর দিন। এর জন্য আপনাদের হয়তো পুরস্কারও দেওয়া হবে।'

নন্দগোপাল পশুপতিকে ঠেলা দিয়ে বললেন, 'এ কোন জায়গার কথা বলছে বলো তো!'

'ঠিক আঁচ করতে পারছি না। বিলেতেও বোধ হয় ময়নাগড় বলে কোনও জায়গা আছে।'

'না, বিলেত নয়। তবে সুইজারল্যান্ডে হলেও হতে পারে।'

নীলমাধবের ভাষণ শেষ হওয়ার পর ফের বাজারের বিকিকিনি শুরু হল।

পাঁচুর মনটা ভালো নেই। এইসব গণ্ডগ্রাম থেকে অনেক দূরে হেলাবটতলার পাথরের উপর চুপচাপ বসে ভাবছিল সে। আজ হঠাৎ সে বুঝতে পারছে, পাঁচু হয়ে জন্মানোটাই তার ভুল হয়েছে। তাকে কেউ পোছে না, পাত্তা দেয় না, খাতির করে না, বসে তার সঙ্গে কেউ দুটো কথা অবধি কয় না। এমনকী তার নিজের বাড়িতেও তাকে কেউ যেন দেখেও দেখতে পায় না। বরাবর তাকে লোকে বোকা, গাধা ইত্যাদি বলে এসেছে। স্কুলের মাস্টারমশাই একবাক্যে বলতেন, 'তোর কিছু হবে না।'

মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে না পারলে বেঁচে থেকে লাভ কী? কিন্তু এই মানুষের মতো মানুষ হওয়ার কথাতেই সে মুশকিলে পড়ে যায়। দুনিয়ায় তো হরেক কিসিমের মানুষ। কোন মানুষটার মতো মানুষ হলে ভালো হয় সেটাও তো বোঝা দরকার। তাই আজ বসে গম্ভীর হয়ে খুব ভাবছে পাঁচু।

কে একটা লোক এসে তার পাশটিতে বসে বলল, 'এ জায়গাটাই তো ময়নাগড়, নাকি হে?'

পাঁচু আড়চোখে লক্ষ করল, লোকটা বেজায় ঢ্যাঙা, খুব ফরসা, গায়ে ঢোলা পোশাক আর পোঁটলাপুঁটলি আছে। ফিরিওলাই হবে বোধ হয়।

ছেলেটাকে পাঁচুর খারাপ লাগল না। তবে তার মনটা ভালো নেই বলে খুব উদাস গলায় বলল, 'এ হল ময়নাগড়।'

ছেলেটা খুব মিষ্টি করে জিগ্যেস করল, 'তুমি কে ভাই?'

পাঁচুর সঙ্গে এত মিষ্টি করে কেউ কখনও কথা বলে না। তাই তার ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। সে একটু নড়েচড়ে বসে বলল, 'আমি হলুম পাঁচু, এ-গাঁয়ের সবচেয়ে বোকা লোক।'

ছেলেটা চোখ কপালে তুলে বলে, 'অ্যাঁ! বলো কী? তুমি যে বোকা তা বুঝলে কী করে?'

'বোকা না হলে আমার আজ অবধি কিছু হল না কেন বলো তো! ক্লাস এইটে ফেল্টু মেরে লেখাপড়ায় ইস্তফা দিতে হল। বাপ, মা, দাদা, দিদি, মাস্টারমশাইরা সবাই বলতেন, 'তোর কিছু হবে না।' ভারী রাগ হল, বুঝলে! লেখাপড়া হল না বলে খারাপ লোক হওয়ার জন্য খুঁজে-খুঁজে পলাশপুরের জঙ্গলে গিয়ে হাবু ডাকাতের সাঙাত হওয়ার চেষ্টা করলাম। দু-চারদিন তালিম দেওয়ার পর হাবু বলল, 'ওরে, তোর লাইন এটা নয়। যা বাপু, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যা।' কিছুদিন তক্কে-তক্কে থেকে একদিন টকাইচোরকে গিয়ে ধরে পড়লুম। তা টকাই ফেলল না। যত্ন করে বিদ্যে শেখাতে লাগল। মাসখানেক পরে হাল ছেড়ে দিয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'না রে পাঁচু, এ জিনিস তোর হবে না। ভালো চোর হতে গেলে একটু মাথা চাই রে। চালাক-চতুর-চটপটে না হলে চুরি-বিদ্যা কি শেখা যায়?' তারপর এর, ওর, তার মতো হওয়ার অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু মেহনতই সার হল, যে পাঁচু সেই পাঁচুই রয়ে গেলাম। আজ সকাল থেকে নিজেকে বেজায় বোকা-বোকা লাগছে। মনে হচ্ছে বুদ্ধিটা আরও একধাপ নেমে গেছে।'

'তা হলে তো তোমার সময়টা খারাপই যাচ্ছে।'

'খুব খারাপ, বেঁচে থাকতেই ইচ্ছে করছে না। মরতেই ইচ্ছে যাচ্ছে, বুঝলে! কিন্তু সনাতনদাদুর অবস্থা দেখে মরতেও ভয়-ভয় করছে।'

'সনাতনদাদুটা আবার কে?'

'সে তুমি চিনবে না। আমি তো সারা গাঁয়ে টহল দিয়ে বেড়াই, আনাচ-কানাচ, কোনা-খামচি সব চিনি। ময়নাগড়ের বৃত্তান্ত আমার মতো কেউ জানে না। গাঁয়ের শেষে পেত্নিরজলা বলে একটা মস্ত মজা দিঘি আছে, জানো তো! ধারে ফলসা বন, সেটা পেরিয়ে গিয়ে মজা দিঘির উপরে গহীন জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটা উঁচু-উঁচু ঢিবি আছে। তা, সেইসব ঢিবির একটাতে গিয়ে আমি বসে থাকতাম দুপুরবেলায়। একদিন বসে আছি, চারদিকে ঝাঁ-ঝাঁ করছে চোতমাসের দুপুর, হঠাৎ যেন কাছেপিঠে একটা দরজার হুড়কো খোলার সব্দ হল। ভারী অবাক হলাম। এই জঙ্গলে তো বাড়িঘরের চিহ্নমাত্র নেই, তবে দরজা

খোলে কে? তখন নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি, ঢিবির তলার দিকে একটা পুরোনো কেলে দরজার কানা একটু ফাঁক করে একজন অষ্টাবক্র কৃকলাশের মতো রোগা লোক বেরিয়ে এল। পরনে একটা নেংটি গোছের, আদুড় গা। আমি যে-ই উপর থেকে 'কে' বলে হাঁক মেরেছি, অমনি ভিতরে ঢুকে ঝপ করে দরজা সেঁটে দিল। আমি তাড়াতাড়ি নীচে গিয়ে দরজার জায়গাটা ভালো করে দেখলুম। দরজা বলে বোঝার উপায় নেই। উপরে পুরু মাটি জমে আছে, তাতে গাছপালা গজিয়েছে। মাটি খানিক খামচে সরিয়ে দরজার কড়া পেলাম বটে, কিন্তু বিস্তর ডাকাডাকি আর টানাটানিতে দরজা খোলেনি। তারপর রোজ গিয়ে দুপুরে তক্কে-তক্কে ঢিবির উপর বসে নজর রাখি। দিনপনেরো বাদে লোকটা ফের বেরোল। এবার আর আমি হাঁক মারিনি। সোজা দুই লাফে নেমে গিয়ে লোকটাকে জাপটে ধরেছি। কিন্তু কী আশ্চর্য কাণ্ড, ধরতেই পারলুম না, আমার হাত যেন হাওয়া কেটে ফিরে এল।'

'বটে?'

'হ্যাঁ গো। তবে এবার আর লোকটা পালাল না। আমাকে খুব মন দিয়ে দেখল। তারপর বলল, 'কেন মিছে হয়রান হচ্ছিস বাবা? আমি চোর-ছ্যাঁচোড় নই। তিনশো বছর ধরে নিজের সম্পত্তি আগলে বসে আছি। মাঝে-মাঝে একটু হাঁফ ছাড়তে বেরোই। তা তুই এখানে ছোঁক-ছোঁক করছিস কেন? বলতে নেই, আমি একটু ঘেবড়ে গিয়েছিলাম। তবে লোকটা তেমন খারাপ নয়। দুঃখ করে বলল, 'বিষয় হল বিষ। বুঝলি, ওই যে বিষয়-চিন্তা করতে-করতে পটল তুলেছিলুম, সেই থেকে আর আত্মাটার সদগতি হল না। ঢিবির মধ্যে সেঁধিয়েই এতগুলো বছর কেটে গেল।'

'বাঃ, তোমার তো খুব সাহস!'

ঠোঁট উলটে পাঁচু বলে, 'সাহসের কাজ তো কিছু নয়। এমনিতে তো গাঁয়ের লোক কেউ আমাকে মানুষ বলেই মনে করে না, কথাটথাও কয় না। হয়তো ভাবে, বোকা ছেলেটার সঙ্গে কথা কয়ে হবেটা কী? কিন্তু সনাতনদাদু সেদিক দিয়ে ভালো। অনেক কথাটথা কইল। একদিন আমাকে বাড়ির মধ্যেও নিয়ে গেল।'

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল, 'না হে, তোমার সাহস আছে। তা কী দেখলে সেখানে?' পাঁচু চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'অন্ধকারে কি কিছু দেখা যায়। কয়েকটা লোহার বাক্স আছে মনে হল, তাতে বড়-বড় তালা ঝুলছে।'

'সে তো গুপ্তধন। তোমার লোভ হল না?'

'নাঃ। সনাতনদাদুর দশা দেখে আমার লোভ উবে গেল। মরার ইচ্ছেও চলে গেল।'

'এখনও কি সনাতনদাদুর কাছে যাও?'

'যাই মাঝে-মাঝে। সাতদিন ঘুমোয়, সপ্তাহে একদিন মোটে বেরোয়। গায়ে একটু রোদটোদ লাগিয়ে ফের ঢুকে যায়।'

'তুমি কি বুঝতে পেরেছ যে, তোমার সনাতনদাদু আসলে ভূত?'

পাঁচু ফের ঠোঁট উলটে বলল, 'তাতে কী? ভূত কি আর মানুষ নয়? অত দূরেই বা যেতে হবে কেন, এই তো হোথায় তেঁতুলতলার বটগাছে বক্কেশ্বর থাকে। শীতলামন্দিরের পিছনে থাকে কলসি-কানাই, শ্মশানের কালীমন্দিরের পিছনে থাকে দেড়েল-রঘু।''

ছেলেটা অবাক হয়ে বলল, 'এদের সঙ্গেও তোমার ভাব আছে নাকি?'

'নাঃ। বক্কেশ্বর খুব ভিতু আর লাজুক। কলসি-কানাইকে নাকি কোন সাধুবাবা বলেছিল, তিন লক্ষ তিন হাজার তিনশো তিনটে সুচে সুতো পরাতে পারলেই নাকি সে যা চাইবে তাই পাবে। শুনেছি, কানাই নাকি মোট তিন হাজার সুচে সুতো পরাতে পেরেছিল। তারপরেই একদিন বউয়ের সঙ্গে ওই সুচে সুতো পরানো নিয়েই ঝগড়া লেগেছিল তার। ঝগড়া লাগারই কথা। কানাই যা রোজগার করত তার প্রায় সবটাই চলে যেত সুচ আর সুতো কিনতে। সংসারের সব কাজ ফেলে দিন-রাত শুধু সুচে সুতো পরালে কার না বউ রাগ করবে বলো! তা রেগে গিয়েই বউ বলেছিল, 'তোমার কি দড়ি-কলসি জোটে না!' এ-কথায় রেগে গিয়ে কানাই গলায় কলসি বেঁধে ঝিলে গিয়ে ডুব দিল। দিল তো দিলই। এখন সে বাকি সুচগুলোয় সুতো পরিয়ে যাচ্ছে। দম ফেলার ফুরসত নেই।'

'আর দেড়েল-রঘু?'

'ও বাবা! সে মস্ত তান্ত্রিক। সাধন-ভজন নিয়ে থাকে, কারও দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। তবে তারও শুনেছি একটা দুঃখ আছে। বেঁচে থাকতে তার দাড়ি মোট আড়াই হাত লম্বা হয়েছিল। তার খুব শখ ছিল চার হাত দাড়ির। দাড়ি মাটিতে ঘষটে যাবে, লোকে চেয়ে দেখবে, তবে না দাড়ির মহিমা। দাড়ির এমনই নেশা হয়েছিল যে, রঘু যখন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে কালীর দেখা পেল, আর মাকালী যখন বর দিতে চাইল, তখন রঘু চার হাত দাড়ির বর চেয়েছিল।'

'এঃ হেঃ, মাত্র চার হাত?'

'আপনি তো বলেই খালাস, মাত্র চার হাত! কিন্তু চার হাত দাড়ি নিয়ে বেঁটেখাটো নাটা মানুষ রঘু যে কী মুশকিলে পড়ল তা বলার নয়। দাড়ি মাটিতে ছেঁচড়ে যায়, আর তাতে মাটি ঝাঁটপাট হয় বটে, কিন্তু দাড়িতে উঠে আসে বিস্তর ময়লা, কাঠকুটো, ইঁদুরছানা, আরশোলা, ব্যাঙ, কাঁকড়াবিছে, কেন্নো, পিঁপড়ে। তা ছাড়া বে-খেয়ালে নিজের দাড়িতে পা বেঁধে কতবার আছাড় খেয়েছে তার হিসেব নেই। শেষে সেই দাড়ির জন্যেই তো প্রাণটাও

গেল? ধানখেতের আলের রাস্তায় ওই দাড়িতে আটকেই একটা কেউটের বাচ্চা উঠে এসেছিল কিনা। তারপর আর দেখতে হল না।'

'বাঃ, ময়নাগড়ের সব ভূতের বৃত্তান্তই তো তোমার জানা দেখছি।'

'বোকা লোকদের তো ওইটেই সুবিধে। যা দেখে তাই বিশ্বাস করে। লেখাপড়া জানা চালাকচতুর লোকের তো তা নয়। ভূত দেখলেও নানা ফ্যাকড়া তুলে, কূটকাচালি করে ওটা যে ভূত নয় সেটা প্রমাণ করেই ছাড়বে। কিন্তু আপনি কে বলুন তো! আপনাকে আমি ঠিক চিনতে পারছি না।'

'চেনার কথাও নয় কিনা। আমার নাম হিজিবিজি।'

পাঁচু একটু ভেবে ঘাড় কাত করে বলল, 'বাঃ, বেশ নাম! ভুল হওয়ার জো নেই। তা এ-গাঁয়ে কাকে খুঁজছেন?'

'কাউকেই নয়। এ-পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম, একটু জিরিয়ে নিতে থেমেছি। তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে ভারী ভালো লাগছে। ইচ্ছে হচ্ছে, দুটো দিন থেকে যাই।'

ভারী লজ্জা পেয়ে পাঁচু বলে, 'যাঃ কী যে বলেন! আমার সঙ্গে দেখা হলে সবাই তো বিরক্তই হয়। কেউ খুশি হয় না তো। অনেকে তো আমাকে দূর থেকে দেখে দরজা বন্ধ করে দেয়।'

'তা হলে আমিও বোধ হয় তোমার মতোই বোকা লোক, তাই তোমাকে আমার বেশ ভালো লাগছে।'

পাঁচু চিন্তিত হয়ে বলে, 'তা-ই বা হয় কী করে? আপনাকে দেখে যে বোকা বলে মনেই হয় না। বরং মনে হয়, আপনি ভীষণ চালাক।'

'তা হলে তোমাকে সত্যিই কথাটাই বলি। তুমি কি জানো যে, দুনিয়ায় বোকা লোকের সংখ্যা ভীষণভাবে কমে যাচ্ছে? আমি সারা দেশ চষে বেড়াই, আজ অবধি একটা খাঁটি, নীরেট বোকা লোক দেখতে পেলাম না।'

পাঁচু মাথা নেড়ে বলে, 'সে ঠিক কথা। এ-গাঁয়েও আমি ছাড়া আর বোকা লোক নেই।'

'আমি আসলে বোকা লোকই খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

ভারী অবাক হয়ে পাঁচু বলে, 'বোকা লোক খুঁজছেন কেন?'

'বোকা লোক না হলে আমার কাজ-কারবারের সুবিধে হয় না কিনা। কিন্তু বোকা লোক খুঁজে বের করা ভারী শক্ত। অনেকে বোকা-বোকা ভাব করে থাকে, আসলে খুব চালাক।

অনেকে আবার এক বিষয়ে বোকা তো অন্য বিষয়ে চালাক। ধরো ইংরিজিতে বোকা, অঙ্কে চালাক। আবার অনেকে আছে এত বেশি চালাক যে, চালাক লোকেরা তাদের চালাকি ধরতে না পেরে বোকা বলে ভেবে নেয়। তা তুমি এদের মতো নও তো!'

মাথা নেড়ে পাঁচু বলে, 'তা তো জানি না। অত জানলে তো চালাকই হতাম।'

হিজিবিজি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'কাজটা খুব শক্ত।'

পাঁচু বলে, 'কোন কাজটা?'

'সত্যিকারের বোকা কিনা তা বুঝতে পারা। তোমাকেও আরও ভালো করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।'

'ও বাবা, খাতা-কলম নিয়ে পরীক্ষায় বসতে হবে নাকি? সে কিন্তু আমি পারব না।' বলেই পাঁচু অবাক হয়ে দ্যাখে, লোকটা আর তার পাশে নেই। চারদিকে চেয়ে কোথাও হিজিবিজিকে দেখতে পেল না পাঁচু। লোকটা স্রেফ হাওয়া হয়ে গেছে।

তিন

লোকে বলে, 'চোরেক্কে চোর, চোর দু-গুনে টকাই।' তা কথাটা মিথ্যে নয়। টকাইকে শুধু চোর বললে গুণী মানুষের অমর্যাদা হয়। এই যেমন কেতুগাঁয়ের হরমন ওস্তাগর। সে কি শুধু দরজি? তা হলে তার হাতের তৈরি পায়জামা পরে রাস্তায় বেরোলে চারদিকে ঠেলাঠেলি পড়ে যায় কেন? আর কেনই বা 'কেয়াবাত কেয়াবাত' ধ্বনি শোনা যায়, মাঝের গাঁয়ের নটবর অতি সুপুরুষ। বিয়ে করতে গেলে হরমনের তৈরি পাঞ্জাবি পরে। তা বিয়ে বাড়িতে বরকে দেখে বরের পাঞ্জাবির প্রশংসায় লোকে এমন শোরগোল তুলে ফেলল যে, নটবর বিয়ে না করেই ফেরত এসেছিল। শুধু কি তাই? হরমনের তৈরি হাফ পেন্টুল পরে কালীপুরের বিখ্যাত কাপুরুষ অভয়পদ অবধি একদিন দিব্যি নিশিদারোগার চোখে চোখ রেখে বুক ফুলিয়ে কথা কয়ে এল। পরে অবস্য ঠান্ডা মাথায় ব্যাপারটা মনে পড়ায় সে ভিরমি খায়। গুণী মানুষের অভাব নেই এ-তল্লাটে। ওই যে খয়রাপোতার ফকির জোলা, রোগাভোগা বুড়ো মানুষ ক্ষয়াটে চেহারা, রুক্ষ দাড়ি আর পাকা চুলে তেমন আহামরি কেউ বলে মনেও হয় না। ঘরে কেঠো তাঁতে গামছা আর লুঙ্গি বানিয়ে বুড়ো হল। তার ওইসব লুঙ্গি আর গামছার জন্য বছরখানেক আগে থেকে আগাম দাম দিয়ে নাম লিখিয়ে রাখতে হয়। হাটের জিনিস তো নয় যে, পয়সা ফেললেই পাওয়া যাবে। ফকিরের লুঙ্গি আর

গামছার সমঝদার সব নবাব-বাদশা গোছের লোক। হিল্লি-দিল্লি থেকে লোক এসে মাথায় ঠেকিয়ে নিয়ে যায়। এ-তল্লাটের লোক সে জিনিস চোখেও দেখতে পায় না। তবে বিক্রমগড়ের রানিমার জন্য একখানা বেনারসী বুনে দিয়েছিল ফকির। মাঘী পূর্ণিমার স্নানের দিন বেনারসীখানা পরে হাতিতে চেপে চানে যাচ্ছিলেন রানিমা। তা বেনারসীটা দেখে হাতিও নাকি সেলাম দিয়েছিল। পরে লোকে বলেছিল, 'রানি না রামধনু তা যেন ভালো করে বোঝাই গেল না, আহা কী রং! কী জেল্লা! চোখ সার্থক।' আর তায়েবগঞ্জের মানুষখেকো বাঘের গপ্পো তো সবাই জানে। তায়েবগঞ্জের ধার ঘেঁষে খয়রাপোতার গভীর জঙ্গলের ধারে মতি পাড়ুই হারানো ছাগল দুখিয়াকে খুঁজতে গিয়ে পড়ে গেল বাঘের খপ্পরে। মতি মনের দুঃখে দুখিয়াকে ডাকতে-ডাকতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কাঁধে এসে পড়ল বিশাল একখানা থাবা। একটি থাবায় তাকে মাটিতে ফেলে বাঘ বেশ করে দিনান্তে জলযোগ সেরে নিতে সবে হাঁ করেছে, ঠিক সেই সময়েই সন্ধের মুখে একটু দূরে নিজের একডেরে ঘরটিতে বসে তমিজ মিয়া পূরবীতে তান ধরলেন। বাস, বাঘ আর কামড় বসাতেই পারল না। খানিকক্ষণ উদাস নয়নে আকাশের দিকে চেয়ে রইল। হিংস্র বাঘ হয়ে গেল স্বপ্নাতুর, থাবার নখ লুকিয়ে ফেলে সেই থাবা দিয়েই চোখের জল মুছতে-মুছতে ধীর পায়ে জঙ্গলে ফিরে গেল। একদিন গভীর রাতে তমিজ মিয়া দরবারি কানাড়ায় আলাপ ধরেছেন, সেইসময়ে তাঁর বাড়ির সামনে গালপাট্টাওয়ালা, জরির সাজ পরা একটা লোককে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে গাঁয়ের চৌকিদার রামলাখন চৌবে গিয়ে লোকটাকে চোখ রাঙিয়ে জিগ্যেস করেছিল, 'ক্যা রে চোট্টা, ক্যা মতলব?'

লোকটা বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'চোপ, এখন গন্ডগোল কোরো না, আমি মিয়া তানসেন, তমিজের গান শুনতে চলে এসেছি।' সেই কথা শুনে রামলাখনের দাঁতকপাটি লেগেছিল।

কথাটা হল, এইসব গুণী মানুষের পাশাপাশি টকাইকেও ধরতে হয়। ওরে বাপু, গাঁ-দেশে চোরের অভাব কী? তবে সেইসব নির্ঘিন্নে চোরেদের দলে তো আর টকাইকে ফেলা যায় না। ছা-পোষা গেরস্তদের ঘরে সে কখনও পায়ের ধুলো দেয়নি। নজর সর্বদা উঁচু। লাখপতি, কোটিপতি ছাড়া তার রোচে না। তার গুণের কথা না বললে অধর্ম হবে। কাউকে সে সর্বস্বান্ত করে আসে না। লাখ টাকার নাগাল পেলেও সে অর্ধেকটা ছেড়ে অর্ধেকটা নেয়। কারও বাড়িতে আবার পরদিনের বাজার-খরচ রেখে আসে।

গোবরদহের মহেন্দ্র সৎচাষির বিশটি হাজার টাকা সে লোপাট করেছিল বটে, কিন্তু তার খোকাখুকুর জন্য রঙিন পোশাক, খেলনা আর তার বউয়ের জন্য দামি শাড়ি রেখে এসেছিল।

লোকে তাই পঞ্চমুখে বলে, 'হ্যাঁ, টকাই সহবত জানে বটে!'

প্রতাপপুরের নকুল প্রতিহার সেদিন চণ্ডীমণ্ডপের আড্ডায় নিজের বাড়ির চুল্লির গল্প ফেঁদে বলল, 'যাই বলো, এমন চোরের কাছে বোকা বনেও সুখ। কী বলব ভাই, দরজায় ভিতর থেকে লোহার বাটাম দেওয়া, তালা মারা, তার উপর আমার সজাগ ঘুম। শেষরাত্রে দেখি, দরজা যেমনকে তেমন বন্ধ আছে। পাশের দরজাটাও দেখলাম আঁট করে সাঁটা, বাথরুম ঘুরে এসে জল খেয়ে শুতে যেতেই হঠাৎ খটকাটা লাগল। আচ্ছা, আমার সদর দরজা তো একটা! তবে দুটো দরজা দেখলাম কেন? তাড়াতাড়ি উঠে বাতি জ্বেলে দেখি, কী বলব ভাই, দেওয়াল কেটে রাতারাতি কে যেন ভারী যত্ন করে দু-নম্বর দরজাটা বানিয়ে গেছে। তখন চৈতন্য হল, তাই তো, খালধারের জমি বেচে লাখদুই টাকা পেয়ে লোহার আলমারিতে রেখেছিলাম যে! তা দেখলাম, আলমারিটাই নেই। অবশ্য তার বদলে ঝাঁ-চকচকে একটা নতুন আলমারি কেউ দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছে। তাতে লাখখানেক টাকা যত্ন করে রাখা আছে। আমার বউয়ের চল্লিশ ভরি গয়না নেই বটে, কিন্তু মেয়ের বিয়ের জন্য গড়ানো গয়নাগুলো সাজিয়ে রেখে গেছে। রাগ করব কী মশাই, চোখে জল এল। কই হে পোদ্দার, তোমার সেই গল্পটা বলো না, সবাই শুনুক।'

বিরিঞ্চি পোদ্দার মুখ থেকে হুঁকোটা সরিয়ে বলল, 'ওঃ, সে এক কাণ্ডই বটে। মাঝরাত্তিরে হঠাৎ সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ হচ্ছে শুনে ধড়মড় করে উঠে দেখি, পাশের ঘরে তিন-চারজন জটাজূটধারী সাধু মাঝখানে ধুনি জ্বেলে একমনে যজ্ঞ করছে। দেখে তো অমি আর গিন্নি ভ্যাবাচ্যাকা। অশৈলী কাণ্ড যাকে বলে! কিছুই বুঝতে না পেরে আমি আর গিন্নি গুটি-গুটি গিয়ে জোড়হাতে পিছনে বসে যজ্ঞ দেখতে লাগলাম। বলব কী ভাই, বিশুদ্ধ সংস্কৃত মন্ত্রে নিখুঁত যজ্ঞ। দেখলে পাষণ্ডেরও ভক্তিভাব এসে পড়ে। তা ঘণ্টাখানেক মুগ্ধ হয়ে যজ্ঞ দেখলাম। তারপর বড় সাধু আমার দিকে ফিরে বলল, 'অবাক হচ্ছিস যে ব্যাটা! এই সাড়ে তিনশো বছর বয়সে হিমালয় থেকে এতদূর ঠেঙিয়ে কি এমনি এসেছি রে আহাম্মক! তোর রিষ্টি কাটাব বলেই আসা। নে, যজ্ঞের তিলক কপালে সেঁটে এবার নিশ্চিন্তে ঘুমো। রিষ্টি কেটে গেছে।'

আমি খুঁতখুঁত করে বললাম, 'যজ্ঞ করলেন, সে তো খুব ভালো কথা! কিন্তু একটু ডাকলেও তো পারতেন, দরজা খুলে দিতুম।'

সাধু অট্টহাসি হেসে বলে, 'কোনও দরজা কি আমাদের আটকাতে পারে রে বোকা! সূক্ষ্ম দেহে সর্বত্র যাতায়াত। ডাকাডাকি করে পাড়াসুদ্ধ লোকের ঘুম ভাঙানো কি ভালো রে বদ্ধ জীব? তা হলে যে সবাই টানাহ্যাঁচড়া করে তাদের বাড়িতে নেওয়ার চেষ্টা করত। এবারটায় শুধু তোর জন্যই আসা কিনা!'

'তা সেই কথা শুনে কেমন যেন ভ্যাবলা হয়ে গেলাম, মাথাটা কাজ করছিল না। গিন্নি তো কেঁদেকেটে একশা। ধাঁ করে একশো এক টাকা প্রণামী দিয়ে ফেলল। তা সাধুরা প্রণামী ছুঁলও না। বড়সাধু বলল, 'টাকাপয়সা নোংরা জিনিস। ওসব আমরা ছুঁই না।' গিন্নি তখন হাতের দু-গাছা বালা খুলে দিয়ে বলল, 'না নিলে গলায় দড়ি দেব বাবা।'

সাধু নাকটাক কুঁচকে চেলাদের বলল, 'নে, তুলে নে। গরিব-দুঃখীর কাজে লাগাস।' তারপর তারা বিদায় হল। পরদিন সকালে দেখি, আলমারি আর বাক্স-প্যাঁটরা সব ফাঁক। ও চোর শুধু চুরি করতেই আসে না রে ভাই, শিক্ষেও দিতে আসে।'

সবাই একমত হয়ে বলল, 'তা বটে!'

তা টকাইয়ের নামডাক আছে বটে, কিন্তু ইদানীং তার কেমন যেন একটু বৈরাগ্য এসেছে। সারাদিন ক্ষণে-ক্ষণে তার দীর্ঘশ্বাস পড়ে আর মাঝে-মাঝে হাহাকার করে ওঠে, 'ওঃ বড় পাপ হয়ে গেল রে।'

তার চেলাচামুণ্ডার অভাব নেই। চেলাদের মধ্যে নবা হল তার একেবারে ছায়া। সর্বদা সঙ্গে সেঁটে আছে। সেবাটেবাও করে খুব। তা টকাইয়ের এসব লক্ষণ তার মোটেই ভালো ঠেকছে না।

বেড়ে বিষ্টুপুরের মহাজন হরমোহন পালের গদিতে হানা দিয়েছিল টকাই। গেল হপ্তার রোববারের ঘটনা। চারখানা জাম্বুবান তালা চোখের পলকে খুলে ফেলল। ভিতরে ঢুকে মজবুত লোহার সিন্দুকের গায়ে মোলয়েম করে হাত বোলাল, আর তাইতেই সিন্দুকের ভারী পাল্লাটাও যেন অবাক হয়ে হাঁ করে ফেলল। ভিতরে না হোক বন্ধকি গয়না আর মোহর আর রুপোর জিনিস মিলিয়ে তিন-চার লাখ টাকার মাল। টকাই তবু শেষ মুহূর্তে হাত গুটিয়ে নিয়ে বলল, 'এসব করা কি ঠিক হচ্ছে রে। লোকে কত খেটেপিটে রোজগার করে, কত কষ্টে এক পয়সা দু'পয়সা করে জমায়। আর আমি পাষণ্ড সেসব লেপেপুঁছে নিয়ে আসি। এ কি ভালো? এসব পাপের কি ক্ষয় আছে? সাত বছর গঙ্গায় ডুবে থাকলে বা সাত হাজার ব্রাহ্মণভোজন করালেও গা থেকে পাপের গন্ধ যাবে না। মরার পর যমরাজা হয়তো আমাকে দেখে আঁতকে উঠে বলবেন, 'ওরে বাপ, এই ঘোর পাপীটাকে নরকে দিলে যে নরকও অপবিত্র হয়ে যাবে।'

নবা জানে, ওস্তাদের আজকাল বড় অনুতাপ যাচ্ছে। সাবধানে কথা কইতে হয়। সে মোলায়েম গলায় ফিসফিস করে বলল, 'আজ্ঞে, আপনি জ্ঞানী মানুষ, আপনার কথার উপরে তো কথা চলে না। তবে কিনা ওস্তাদ, আমরা কি আর ইচ্ছে করে চুরি করি? আমাদের পেট আর অদৃষ্টই যে এ-লাইনে টেনে আনল, আমাদের দোষ কী বলুন!'

টকাই তবু ঘনঘন মাথা নেড়ে বলল, 'ওটা কোনও যুক্তি নয় রে নবা! অভাব, কষ্ট, পেটের দায় থাকলেই কি আর লোকে চুরি করে? তা হলে তো ভিতরে-ভিতরে আমি দগ্ধে মরে যাচ্ছি। সোনাদানা, টাকাপয়সায় আমার বড় অরুচি হয়েছে। এখন আমার সাধুসঙ্গ করা দরকার। খোঁজ নে তো, ভালো সাধু কে আছেন কাছেপিঠে। ধর্মকথা না শুনলে আমার মনটা শান্ত হবে না রে।'

ওস্তাদের কথা অমান্যই বা করে কী করে? তাই নবা পরদিন থেকে খুঁজতে শুরু করে তেরাত্তিরের মাথায় খবর আনল, ময়নাগড়ের উত্তরের জঙ্গলে একজন সাধুগোছের লোক আছেন বটে, তাঁর নাম জটাবাবা। জনসমক্ষে বড় একটা বেরোন না। জঙ্গলের মধ্যে কুটির বানিয়ে আপন মনে সাধনভজন নিয়ে থাকেন।

শুনে টকাইয়ের চোখ উজ্জ্বল হল। বলল, 'বাঃ, এরকম সাধুই তো চাই।'

টকাইয়ের অগম্য জায়গা নেই। পরদিন সকালেই সে ময়নাগড়ের উত্তরের জঙ্গলে গিয়ে হাজির হয়ে গেল। পেত্নি জলার ধারে ফলসাবন, সেটা পেরিয়ে গহীন জঙ্গল। তার মধ্যে একটা বটগাছের তলায় জটাবাবার কুটির খুঁজে বের করতে বিশেষ কষ্ট হল না টকাইয়ের।

কুটিরের চেহারা দেখে অবশ্য কুটির বলে বোঝবার উপায় নেই। রাজ্যের ডালপালা, পাতানাতা দিয়ে কোনওরকমে একটা স্তূপাকার জিনিস খাড়া করা হয়েছে। উপরে খেজুরপাতার ছাউনি, কুটিরে ঢোকার একটা ফোকর আছে বটে, তবে দরজা-জানলার বালাই নেই। বাইরে থেকে হঠাৎ দেখলে মনে হয়, রাজ্যের শুকনো গাছপালা কেউ জড়ো করে রেখেছে। লোকের বাড়িতে রাতবিরেতে ঢোকা টকাইয়ের কাছে জলভাত। কিন্তু সাধু-মহাত্মাদের ঠেক-এ তো আর ওরকমভাবে ঢোকা যায় না। তাই টকাই বাইরে থেকেই হাত জোড় করে জটাবাবার উদ্দেশ্যে মোলায়েম গলায় বলল, 'বাবা!'

ভিতর থেকে প্রথমটায় কোনও সাড়া এল না। গলাখাঁকারি দিয়ে টকাই ফের ডাকল, 'বাবা!'

সাড়া নেই। বারপাঁচেক ডাকাডাকির পর ভিতর থেকে একটা বাজখাঁই গলা বলল, 'কে তুই?'

'আজ্ঞে, আমি এক পাপিষ্ঠ। আমার নাম টকাই।'

'কী চাস?'

টকাই গদগদ গলায় বলল, 'আপনার দয়া চাই বাবা।'

'ভিতরে আয়।'

ফোকরটা দিয়ে সাবধানে বুক ঘষটে ঢুকে পড়ল টকাই, সঙ্গে নবাও।

ভিতরটা অন্ধকার বটে, কিন্তু অন্ধকারেই টকাইয়ের কাজকারবার বলে সে সবই স্পষ্ট দেখতে পেল। একটা কম্বলে ঢাকা উঁচু বেদির মতো আসনে জটাজূটধারী লম্বাটে রোগা চেহারার বেশ তেজস্বী একজন মানুষ বসে আছেন। দাড়িগোঁফ কালোই বটে, তবুও বয়স হয়েছে বোঝা যায়। এই শীতেও খালি গা, তাতে ছাইমাখা। পাশে চিমটে, কমণ্ডলু, বেদির একপাশে বৌলওলা খড়ম। সামনে ধুনি জ্বলছিল, তবে এখন মিইয়ে গিয়ে ধিকিধিকি ছাইচাপা একটু আগুনের আভাস দেখা যাচ্ছে মাত্র। ধুনির বাঁ-ধারে একটা লম্বাপনা ফরসামতো ছোকরা বসে আছে। তবে তাকে সাধুর চেলা বলে মনে হয় না। তার গায়ে ঢোলা পোশাক, একটা বাদ্যযন্ত্র আর একটা পোঁটলা।

জটাবাবাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে টকাই আর নবা ঠান্ডা ভেজা-ভেজা মাটিতেই বসে পড়ল।

জটাবাবা মিটমিট করে তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, 'সঙ্গে ওটি কে?'

জোড়হাতে টকাই বলল, 'আর-এক পাপিষ্ঠ, আমার সাঙাত নবা।'

জটাবাবা মজবুত সাদা দাঁত দেখিয়ে একটু হাসলেন। তারপর বললেন, 'কী পাপ করেছিস বল তো?'

'আজ্ঞে, আমি চোর।'

জটাবাবা যেন চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একটু ভেবে বললেন, 'তা চুরি করা কি পাপ?'

'পাপ নয়! বলেন কী মহারাজ? চুরি করা তো ভয়ংকর পাপ বলেই জানি।'

জটাবাবা যেন আরও চিন্তিত হয়ে বললেন, 'সে তো শুনলাম, কিন্তু কোন আইনে পাপ হচ্ছে সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না। ওরে বাপু হিজিবিজি, তুই জানিস?'

যে ছেলেটা ধুনির পাশে বসেছিল সে হাতে একটা চৌকোমতো ক্যালকুলেটর গোছের যন্ত্রে কী যেন দেখছিল। অখণ্ড মনোযোগ।

এ কথার জবাব দিল না। একটুক্ষণ হাতের যন্ত্রটার দিকে চেয়ে থেকে তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'না, জানি না।'

ফাঁপরে পড়ে টকাই বলল, 'চুরি করা তো সবাই পাপ বলেই জানে।'

জটাবাবা ভাবিত মুখে বললেন, 'তা জানলেই তো হবে না। দুনিয়ার সব জিনিসই ভগবানের সৃষ্টি, নাকি রে?'

'আজ্ঞে, সে তো ঠিকই।'

'তুইও ভগবানেরই সৃষ্টি জীব।'

'যে আজ্ঞে, তাই তো হওয়ার কথা।'

'তা হলে ভগবানের যা কিছু সৃষ্টি, সবতাতেই তোর হক আছে। তা হলে অন্যের জিনিস বলে তো কিছু নেই। সবই তোর এবং সবার। তা হলে চুরিকে পাপ বলি কী করে?'

একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে নড়েচড়ে বসে টকাই বলল, 'তা হলে কি চুরি করা পাপ নয় বাবা? লোকে কি ভুল বলে?'

জটাবাবা গভীর চিন্তিত মুখে বলেন, 'ওরে দাঁড়া, দাঁড়া! অত হুড়ো দিলে কি হয়? ধর, গাছ থেকে একটা ফল পেড়ে নিলি, সেটাও কি গাছের সম্পত্তি নয়? তা হলে সেও তো চুরি! যদি হিসেব করে বিচার করে দেখিস, তা হলে মানুষেরপ্রায় সব কাজই তো চুরির খাতেই ধরতে হয়।'

'তা হলে কি আমার পাপ হয়নি বাবা?'

'উঁহু, তাও বলা যাচ্ছে না। আরও ভেবে দেখতে হবে। এই সক্কালবেলায় এসে বড় চিন্তায় ফেলে দিলি বাপ! ওরে বাপু হিজিবিজি, একটু ভেবে দ্যাখ তো, চুরিটাকে পাপের খাতে ধরা যায় কিনা।'

হিজিবিজি নামের ছেলেটা তার হাতের যন্ত্রটা ঝোলায় পুরে টকাইয়ের দিকে চেয়ে বেশ হাসি-হাসি মুখ করে বলল, 'আপনি চুরি করেন বুঝি?'

জটাবাবা যখন একে নেকনজরে দেখেন, তখন ইনিও একজন মহাত্মাই হবেন ভেবে টকাই হাতজোড় করে বলল, 'যে আজ্ঞে, নিজের উপর বড় ঘেন্না হচ্ছে আজকাল। তা আপনারা সাধু-মহাত্মা লোক, আপনারা যদি ভেবেচিন্তে একটা নিদান দেন তো প্রাণটা জুড়োয়।'

হিজিবিজি একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমরা যে একজন ভাল চোরই খুঁজছি। কিন্তু মনের মতো চোরই কি আর পাওয়া যায়? এ পর্যন্ত অনেক বেছেগুছে সাতজনকে বের করেছি বটে। কিন্তু তাদেরও নানা খাঁকতি। কারও হাত চলে তো পা চলে না, কেউ দিনকানা, কেউ ভারী আনমনা, কারও বা ভূতের ভয়। তা আপনি কেমন চোর?'

নবা হঠাৎ ফুঁসে উঠে বলল, 'তুমিই বা কেমন লোক হে ছোকরা, টকাই ওস্তাদের মুখের উপর জিগ্যেস করছ, কেমন চোর? এ তল্লাটে যার কাছে টকাই ওস্তাদের নাম বলবে, সে-ই জোড়হাত কপালে ঠেকাবে। বলি, টকাই ওস্তাদের নাম শোনোনি, এতদিন কি বিলেতে ছিলে নাকি?'

টকাই বিরক্ত হয়ে নবাকে ধমক দিয়ে বলে, 'আঃ, সাধুমানুষের সঙ্গে ওভাবে কথা কইতে আছে? ওঁরা সাধনভজন নিয়ে থাকেন, চুরি-চামারির খবর রাখবেন কী করে?'

ছেলেটা হঠাৎ চোখ বড়-বড় করে বলল, 'ও, আপনিই টকাই ওস্তাদ? তাই বলুন, আপনি তো প্রাতঃস্মরণীয় মানুষ।'

নবা বুক চিতিয়ে বলল, 'তা হলেই বুঝে দ্যাখো বাপু, কার সঙ্গে কথা কইছ! তিন-তিনবার নিখিল ভারত পরস্বাপহরক সমিতির বর্ষসেরা হয়ে সোনার মেডেল পেয়েছেন। রাজ্যস্তরে পাঁচবার চোর-চ্যাম্পিয়ন। দেশের সেরা সম্মান 'তস্কররত্ন'ও দেওয়ার তোড়জোড় চলছে। টকাই ওস্তাদের মর্ম তুমি কী বুঝবে হে সেদিনের ছোকরা?'

হিজিবিজি লাজুক একটু হেসে ভারী লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'ছি ছি, এরকম একজন গুণী মানুষকে চিনতে না পারায় ভারী বেয়াদপি হয়ে গেছে। আমি ছোট ছেলে বলে মাপ

করে দিন। মাত্র বারো বছর বয়স, কত কী শেখার বাকি!'

নবা চোখ পিটপিট করে বলল, 'কার বারো বছর বয়স?'

'আমার কথাই বলছি।'

'শোনো বাপু, একসময় মালদহে দুশো আমকে একশো বলে ধরা হত। দেদার আম ফলত বলে ওটাই ছিল রেওয়াজ। একশো আম কিনলে একশো আম ফাউ। তা তুমি কত বছরে এক বছর ধরছ?'

ছেলেটা মিষ্টি হেসে বলল, 'হিসেব খুব সোজা। আমাদের দেশে আঠারো মাসে বছর কিনা!'

'কেন হে বাপু, তোমাদের আঠারো মাসে বছর কেন? বারো মাসে সুবিধে হচ্ছে না বুঝি!'

'আমাদের বছর বড় গড়িমসি করে ঘোরে যে! তার বড্ড আলিস্যি। তার উপর আপনাদের চেনা তিরিশটি দিন পেরোলেই মাস পুরে যায়। আমাদের কী তা হওয়ার জো আছে? মাস আর পুরোতেই চায় না। গড়াতে-গড়াতে সেই একশো কুড়ি দিনে মাস পূর্ণ হয়।'

চোখ গোল-গোল করে শুনছিল নবা, বলল, 'ও বাবা! এ যে একেবারে বোম্বাই মাস হে বাপু! মাসমাইনে পেতে গেরস্তের যে হাপিত্যেশ করে বসে থাকতে হয়। একশো কুড়ি দিন মানে কত হপ্তায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে বলো তো?'

'হপ্তা? না মশাই, আমাদের হপ্তা নেই। আমাদের হল দশতা!'

'দশতা জন্মে শুনিনি বাপু, সে আবার কী বস্তু?'

ভারী লজ্জায় মরমে মরে গিয়ে হিজিবিজি বলে, 'আপনাদের যেমন সাতদিনে হপ্তা, আমাদের তেমনই দশতা। আমাদের বড় ঢিলাঢালা ব্যাপার মশাই। সকালে সুয্যিঠাকুর উদয় হলেন বটে, কিন্তু তারপর আর নড়তেই চান না। মধ্য গগনে উঠছেন, যেন বেতো রুগি। সকালে আমাদের বারতিনেক প্রাতঃরাশ করতে হয়। মধ্যাহ্নভোজনও কম করে বারতিনেক। নৈশভোজও ধরুন তিন থেকে চারবার।'

'বাপ রে! তবে তো খেয়েই তোমরা ফতুর!'

'তা তো বটেই। কিন্তু কী করা যাবে বলুন! আমাদের যে বাহাত্তর ঘণ্টায় একটা দিন।'

'বলো কী হে?'

'তাও যদি আপনাদের ঘণ্টার মতো চটজলদি ঘণ্টা হত। তা ধরুন, আমাদের ঘণ্টার মাপটাও একটু বেঢপ রকমের। মোট একশো আশি মিনিট।'

'বটে হে!'

'তার উপর আবার এক মিনিটও কী সহজে হয়? দুশো চল্লিশ সেকেন্ড পর মিনিটের কাঁটা নড়ে।'

'বাপ রে! না বাপু, তা হলে তোমার ন্যায্য বারো বছর বয়সই বটে। বরং একটু বেশিই ধরা হচ্ছে। আট কী সাত হলেই যেন মানায়। তা তোমাদের দেশটা কোথায় বলো তো! শুনেছি, বিলেতে নাকি ওরকম সব অশৈলী কাণ্ড হয়। সেখানে কাকের রং সাদা, বিধবাদের একদাশী নেই, শীতকালে আকাশ থেকে কাঠি-বরফ পড়ে।'

হিজিবিজি ভাল মানুষের মতো মুখ করে বলে, 'বিলেত নয়, আমার দেশটা একটু দূরে।' নবা মাথা নেড়ে বলে, 'তা হয় কী করে? বিলেতের পরই তো পৃথিবী শেষ। তারপর আর ডাঙা জমিই নেই।'

'আমার দেশটা ওদিকপানে নয় কিনা!'

'তবে কোন দিকটায় বলো তো! সাতবেড়ে পেরিয়ে নাকি? সাতবেড়েয় আমার খুড়শ্বশুরের বাড়ি কিনা! জব্বর জায়গা। তা শুনেছি বটে সাতবেড়ে পেরিয়ে ঘুরঘুট্টি নামে একটা জায়গা আছে, সেখানে হাটে ভূতের তেল বিক্রি হয়। সেখানে নৃমুণ্ডমালিনী নামে এক ধরনের গাছ আছে, লাল টকটকে ইয়া বড়-বড় ফুল হয়, তারপর ফুলের ভিতর থেকে নরমুণ্ডের মতো ফল বেরোয়। সেই গাছে পাখি বাসা বাঁধে না, তলা দিয়ে মানুষ কেন, কুকুর-বিড়ালও যায় না। কাছে গেলেই কপাত করে গিলে ফেলে। তা কানাঘুষো যেন শুনেছিলাম যে, সেখানেও দিন-রাত্তির একটু অন্য নিয়মের।'

'আমার দেশের নাম ঘুরঘুট্টি নয়।'

'তা হলে?'

'সে আরও বেনিয়মের জায়গা মশাই! দেশটার নাম হল রূপকথা।'

'অ্যাঁ! রূপকথা! মনসাপোতা নয়, সাতবেড়ে নয়, গ্যাঁড়া শিবতলা নয়, একেবারে রূপকথা। এ আবার কেমন নাম হে! নামটা তেমন মজবুত নাম নয় তো! কেমন যেন এলিয়ে পড়া ভাব নামের মধ্যে! উচ্চারণ করে জুত হচ্ছে না তো!'

'আমাদের ভাষায় অবশ্য জায়গাটার নাম ডোডো।'

নবা অবাক হয়ে বলে, 'বাড়িতে কি তোমরা ইংরিজিতে কথা কও নাকি?

'না মশাই, আমরা ডোডো ভাষাতেই কথা কই।'

নবা হাল ছেড়ে দিয়ে বলে, 'না বাপু, তোমার কথাবার্তা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

এদিকে যে এত কথাবার্তা হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে মোটেই খেয়াল নেই টকাইয়ের। সে জটাবাবার মুখের দিকে চেয়ে হাতজোড় করে সেই যে তদগত হয়ে আছে, আর কোনওদিকে হুঁশই নেই। ওদিকে জটাবাবাও সেই যে ধ্যানস্থ হয়েছেন, আর চোখ খোলেননি।

নবা গলাটা কয়েক পরদা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'তুমি কি জটাবাবার চেলা নাকি হে বাপু?'

হিজিবিজি বলল, 'তা একরকম বলতে পারেন।'

নবা একটা হাই তুলে বলল, 'তা ধর্মকর্ম হয়তো ভালো জিনিসই হবে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, ওতে তেমন গা গরম হয় না। চুরি-ছ্যাচড়ামির মধ্যে বেশ একটা গা গরম করা ব্যাপার আছে। ধর্মেকর্মে তো কেবল ভালো-ভালো কথা আর উপদেশ। আমাদের কি ওসব পোষায়? তবে কিনা টকাই ওস্তাদের হঠাৎ বাই চেপেছে বলে আসা। তা জটাবাবা তো পষ্টাপষ্টি বলেই দিলেন যে, চুরি করা তেমন খারাপ কিছু নয়। এখন ফিরে গিয়ে কাজকর্মে মন দিলেই বাঁচি। তা বাপু, তোমরা চোর খুঁজছ কেন? সুলুকসন্ধান কিছু আছে নাকি?'

হিজিবিজি ভারী মিষ্টি হেসে বলল, 'আছে বইকি।'

নবা সাগ্রহে বলল, 'আহা; একটু খোলসা করে বলেই ফ্যালো না। তেমন বড় দাঁও হলে ওস্তাদকে আমি ঠিক রাজি করিয়ে ফেলব।'

হিজিবিজি ভালো মানুষের মতো মুখ করে বলল, 'আজ্ঞে, চোর খুঁজছি আমাদের দেশে নিয়ে যাব বলে।'

নবা অবাক হয়ে বলে, 'যাঃ, চোর আবার কেউ নিয়ে যায় নাকি? কেন বাপু, তোমাদের গাঁয়ে কি চোর নেই নাকি?'

'আজ্ঞে না। চোরের বড়ই অভাব।'

'তবে কি সেখানে সবাই ডাকাত?'

'ডাকাতই বা দেখলাম কোথায়? না মশাই, চোর-ডাকাত ওসব কিছুই আমাদের নেই। সেই জন্যই গোটাকয়েক চোর আর ডাকাত নিয়ে যেতে চাইছি লোককে দেখাব বলে।'

নবা চিন্তিত হলে বলে, 'চোর-ডাকাত নেই? সে আবার কেমন জায়গা হে! এ তো মোটেই ভালো কথা নয়! ভগবানের দুনিয়ায় বাঘ-সিংহ, শেয়াল-কুকুর, বিড়াল-ইঁদুর, কাক-বক, কোনওটা বাদ দিলে কি চলে? তোমাদের বাপু সৃষ্টিছাড়া গাঁ। রূপকথায় গিয়ে আমাদের জুত হবে না হে।'

ঠিক এই সময়ে ধ্যানস্থ জটাবাবা হঠাৎ বাঁ-চোখটা পট করে খুলে টকাইয়ের দিকে তাকালেন। তারপর বজ্রনির্ঘোষে বললেন, 'যা ব্যাটা, ধ্যানযোগে গিয়ে চিত্রগুপ্তের খাতায় তোর পাপপুন্যির হিসেবটায় চোখ বুলিয়ে এলুম। না, চুরি বাবদ তোর পাপের খাতে কিছুই ধরা হয়নি। নিশ্চিন্তে বাড়ি গিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমো। সামনের অমাবস্যায় রাত এগারোটায় এইখানে চলে আসবি। পাপতাপ যা করেছিস, সব ঝেড়ে নামিয়ে দেব। তারপর মন্তর পাঠ। এখন বিদেয় হ'।'

গদগদ হয়ে টকাই তাড়াতাড়ি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উঠে পড়ল, সঙ্গে নবাও।

জটাবাবার ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে বেশ খানিকটা তফাত হওয়ার পর হঠাৎ টকাইয়ের ভক্তিভাবটা খসে গিয়ে কপালে ভ্রূকুটি দেখা দিল। গম্ভীর গলায় ডাকল, 'নবা!'

নবা পিছন থেকে বলল, 'আজ্ঞে!'

'চুরি-ডাকাতি খুব খারাপ জিনিস, বুঝলি!'

'যে আজ্ঞে, তবে কিনা...'

টকাই হাত তুলে তাকে থামিয়ে বলল, 'এ কথাও ঠিক যে, চুরি-ডাকাতির উপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে।'

'যে আজ্ঞে, সেই কথা ভেবে-ভেবেই তো আমার রাতে ঘুম নেই। কাল রাতেই তো গিন্নি ফুলকপি দিয়ে কই মাছ রেঁধেছিল। এক কাঠা চালের ভাত উড়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু কী বলব ওস্তাদ, দু-গরাসও গিলতে পারিনি।'

টকাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তুই কতকাল আমার শাগরেদি করছিস বল তো নবা?'

'তা ধরুন, সামনের অঘ্রানে দশ বছর পুরবে।'

'দশটি বছর আমার সঙ্গে থেকে শিখলি কী বল তো! এখনও তোর দেখার চোখ ফুটল না। কান তৈরি হল না, মগজ সজাগ হল না, হাত-পায়ের আড় ভাঙল না। সেই যে প্রথম দিন তোকে পরীক্ষা করার জন্য পটলার সাইকেলখানা চুরি করে আনতে পাঠিয়েছিলাম, সে-কথা মনে আছে?'

ভারী লজ্জা পেয়ে নবা বলে, 'তা আর নেই! খুব মনে আছে।'

'জলের মতো সোজা কাজটা যেভাবে ভণ্ডুল করেছিলি, তাতেই এলেম বোঝা গিয়েছিল তোর।'

নবা কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'তা কী করব ওস্তাদ, হাঁদারাম পটল যে তার সাইকেলের পিছনের চাকায় শেকল পরিয়ে তালা দিয়ে রেখেছে, তা কে জানত? সাইকেলটা টেনে নিয়েই চটপট উঠে পড়ে চালাতে গিয়েই দড়াম করে পড়লুম যে! প্রথম কেস তো!'

'সে না হয় হল। প্রথমটায় লোকে ভুলচুক করতেই পারে। সেটা ধরছি না। কিন্তু এই গেল হপ্তায় শিবু সমাদ্দারের বুড়ো পিসেমশাইয়ের হাতে ধরা পড়ে যে পঞ্চাশবার কান ধরে ওঠবোস করলি, তাতে যে আমার কতখানি বেইজ্জত হল, তা খেয়াল করেছিস?'

নবা ভারী অপ্রস্তুত হয়ে মাথা চুলকে বলল, 'আজ্ঞে ওস্তাদ, পাকা খবর ছিল যে, শিবু সেদিন মাদারপুরে শ্বশুরবাড়িতে গেছে। তাই নিশ্চিন্তে তার ঘরে ঢুকে মনের আনন্দে জিনিসপত্র সরাতে লেগেছিলাম। তা মেলা খুচরো জিনিস হয়ে যাওয়ায়, ভাবলুম, বিছানার চাদরে বেঁধে একটা পোঁটলা করে নিলে সুবিধে হবে। তখন কী আর টের পেয়েছিলাম যে, বিছানায় শিবুর বুড়ো পিসেমশাই শুয়ে আছে। মাইরি, বিশ্বাস করুন, শিবুর যে কস্মিনকালে কোনও পিসেমশাই আছে, সেটাও আমার জানা ছিল না। কোন গোবিন্দপুর গাঁ থেকে সেদিন রাতেই এসে হাজির হয়েছে। তা পোঁটলা বেঁধে তুলতে গিয়ে দেখি বেজায় ভারী। তখন কী আর জানতুম যে, জিনিসপত্রের সঙ্গে শিবুর পিসেমশাইও পোঁটলাসই হয়েছে! কেঁদে-ককিয়ে পোঁটলা সবে ঘাড়ে তুলেছি, অমনই পোঁটলার ভিতর থেকে দুখানা হাত বেরিয়ে এসে গলাটা পেঁচিয়ে ধরে বড্ড বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিল। প্রথমে ভেবেছিলুম, ভূত! তাই একটু চেঁচামেচিও করে ফেলেছিলুম বটে! কপালটাই আমার খারাপ! নইলে পোঁটলার হাত গজাবে কেন?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টকাই বলল, 'শিবুর পিসেমশাইয়ের বয়স কত জানিস? একানব্বই বছর! হিসেব মতো থুত্থুড়ে বুড়ো, আর তুই ত্রিশ বছরের জোয়ান মর্দ। ঘাড়ে-গর্দানে চেহারা নিয়ে কোন আক্কেলে তুই বুড়ো মানুষটার হাতে নাকাল হলি বলতে পারিস?'

'মুশকিল কী জানো ওস্তাদ, আচমকা কাণ্ডটা হওয়ায় ঘাবড়ে গিয়েছিলুম কিনা! আর ঘাবড়ে গেলে আমার শরীরটা ভারী দুর্বল হয়ে পড়ে। তার উপর শিবুর পিসেমশাই হল গে বুড়ো মানুষ! বয়োজ্যেষ্ঠ, গুরুজন! বয়সের মানুষকে তো একটু সম্মানও দেখাতে হয়! তাই তার অপমান হবে ভেবে পালাতে ইচ্ছে হল না।'

'তাই পায়ে ধরে কেঁদেকেটে ক্ষমা চেয়েছিলি?'

'না না, পায়ে ধরার লোক আমি নই। যতদূর মনে আছে, হাঁটুর নীচে নামিনি। আর কান্না বলে লোকে মনে করলেও, ও ঠিক কান্না নয়। বেজায় সর্দি লেগেছিল বলে একটু ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ ভাব ছিল। কান্না হতে যাবে কেন?'

'আর কান ধরে যে তোকে লোকজনের সামনে ওঠ-বোস করাল, সেটা বুঝি অপমান নয়?'

নবা একটু গ্যালগ্যালে হাসি হেসে বলল, 'তা ওঠ-বোস করেছি বইকি! সেদিন বিকেলে ডন-বৈঠক মারতে বেবাক ভুলে গিয়েছিলুম কিনা! তা পিসেমশাই যখন ওঠ-বোস করতে বলল, তখন ভাবলুম, ভালোই হল! এই মওকায় মেরে নিই। হেঃ হেঃ, লোকে অবিশ্যি বুঝতে পারেনি। সবাই ভেবে নিল, আমি বোধহয় সত্যিই ভয় পেয়ে কান ধরে ওঠ-বোস করছি। কিন্তু আমি যে কায়দা করে বৈঠকি মারছি, সেটা আহাম্মকেরা ধরতেই পারেনি। হেঃ হেঃ, দিব্যি বোকা বানিয়ে এসেছি সবাইকে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টকাই বলল, 'কেলেঙ্কারী যা করার তা তো করেইছিস, কিন্তু তা বলে কোন বুদ্ধিতে তুই শিবুর পিসেমশাইকে বলতে গিয়েছিলি যে, তুই আমার চেলা! নামটা ফাঁস করা কি তোর উচিত হল?'

ভারী অবাক হয়ে নবা বলে, 'নাম নেব না মানে? আমি কত বড় ওস্তাদের শাগরেদ, সেটা পাঁচ জনকে বুক ঠুকে না বলে পারি? টকাই ওস্তাদের চেলা শুনলে যে লোকে হাতজোড় করে, পথ ছেড়ে দেয়।'

'বটে! তা হলে শিবুর পিসেমশাই সেটা করল না কেন?'

নবা একটু ভেবে বলল, 'হ্যাঁ, সেটা একটা কথা বটে! তবে বুড়ো মানুষদের তো ভীমরতিতেও ধরে। তারপর ধরুন, কানেও হয়তো খাটো; তারপর ধরুন, ঝোঁকের মাথায় অপমানটা করে ফেলেছে, পরে হয়তো ক্ষমা চাইবে।'

মাথা নেড়ে টকাই বলে, 'ওসব নয় রে, শিবুর পিসেমশাই হরদেব সিংহ আমার কাছে দুঃখ করে বলেছে, 'ওরে টকাই, তোর যে এমন দুরবস্থা হয়েছে, তা তো জানতুম না। তুই

কত বড় ওস্তাদ ছিলি, লোকের পকেট মারলে পকেট নিজেও টের পেত না। আর সেই তুই কিনা এসব আনাড়ি লোককে দলে নিয়েছিস! এ তো চুরির অ-আ-ক-খ'ই শেখেনি!'''

নবা ছলছল চোখে বলল, 'আরে ওস্তাদ, আমিও তো সেই কথাটাই আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি। আপনি লাইন ছেড়ে দিলে আমার মতো অপদার্থ অপোগণ্ডের কী হবে! চুরি সমুদ্রের তীরে আমি যে এখনও নুড়ি কুড়োচ্ছি! জটাবাবা কী বলল শুনলেন না! চুরি মোটেই পাপের মধ্যেই পড়ে না। অত বড় সাধক, ত্রিকালজ্ঞ, টক করে চিত্রগুপ্তের খাতায় অবধি উঁকি মেরে এসে বললে, আপনার পাপের খাতায় কিছু জমা পড়েনি!'

টকাই ভ্রূকুটি করে বলল, 'জটাবাবা যাই বলুক, চুরিটুরি যে খারাপ কাজ তাতে সন্দেহ নেই। তবে চোর যদি হতেই হয়, তা হলে চোরের মতো চোর হওয়াই ভাল। দিনকানা, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাহীন, বোকা-হাঁদা, লোভী আর ছুঁকছুঁকে চোর হওয়া ঘেন্নার কাজ। হরদেববাবু কী আর সাধে দুঃখ করছিল, সে ছিল কদমপুরের ডাকসাইটে বড়দারোগা। জাঁহাবাজ লোক। সারা জীবনে মেলাই চোর-ডাকাত ঢিট করেছেন।'

নব বড়-বড় চোখে চেয়ে বলে, 'দারোগা! শিবুর পিসেমশাই তা হলে দারোগা ছিলেন! তাই বলুন। অঙ্কটা তা হলে মিলেই গেল!'

'কী অঙ্ক মেলালি?'

'আজ্ঞে সে যখন আমাকে জাপটে ধরে পেড়ে ফেললে, তখনই আমি ওর গা থেকে পুলিশ-পুলিশ গন্ধ পেয়েছিলাম। চোর ধরার কায়দাকানুনও দেখলুম বেশ রপ্ত। তাই মনে হয়েছিল, এ-লোক পুলিশ না হয়ে যায় না। কিন্তু একে বুড়ো মানুষ, তার উপর গায়ে পুলিশের উর্দিও নেই, ফলে একটা খটকা লেগেছিল।'

'হ্যাঁ রে, পুলিশের গায়ে কী আলাদা গন্ধ থাকে?'

নবা একগাল হেসে বলল, 'তা আর থাকে না! পুলিশের গন্ধ আমার খুব চেনা। সেবার গ্যাঁদালপোতায় মুরগি চুরির দায়ে যখন ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তখন দু-চারটে চড়চাপড় মেরে বড়বাবু শিবেশ্বর পুরকায়েত বলল, 'এটাকে আর ফাটকে পুরে কী হবে? বরং হাতে একটা হাতপাখা ধরিয়ে দে, সারারাত আমাকে বাতাস করুক, যা গরম পড়েছে! তা বড়বাবুকে সারারাত বাতাস করতে-করতে গন্ধটা খুব চিনে রেখেছিলুম। ও ভুল হওয়ার জো নেই। অনেকটা মোষ-মোষ গন্ধ।'

'তোর নাকের তো খুব এলেম দেখছি। তা ভাল চোরের মতো চোর হতে গেলে নাক-মুখ-চোখ সব কিছুই সজাগ হওয়াই দরকার। তা জটাবাবার কুটিরে ঢুকে কোনও গন্ধ পেয়েছিস?'

'তা আর পাইনি ওস্তাদ! খুব পেয়েছি। ফুল, চন্দন, আতর, ধূপকাঠি, সব মিলিয়ে মিশিয়ে ভারী স্বর্গীয় গন্ধ। মনে ভক্তিভাব এসে পড়ে।'

'তোর মাথা! এসবের নামগন্ধও ছিল না।'

'তা হলে?'

'ফাঁকা মাঠ, শুকনো পাতা আর মাটির সোঁদা গন্ধ ছাড়া আরও একটা সন্দেহজনক গন্ধ ছিল। সেটা হল স্পিরিট গামের গন্ধ।'

'সেটা কী জিনিস ওস্তাদ?'

'ওই আঠা দিয়ে যাত্রা-থিয়েটারের অ্যাক্টরের নকল দাড়ি-গোঁফ লাগায়। মনে হচ্ছে জটাবাবার দাড়ি-গোঁফও আসল নয়।

'বলেন কী ওস্তাদ! অমন তেজি দাড়ি দেখে আমি তো ভাবলাম, মস্ত বড় সাধক।'

'সাধক বটে, তবে অন্য জিনিসের। আর ওই হিজিবিজি ছোকরাও দু-নম্বরি জিনিস।'

নবা চোখ গোল-গোল করে বলে, 'বটে ওস্তাদ!'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে টকাই বলে, 'এদের মতলব ভালো নয় রে নবা। জটাবাবার বেদিটা ভালো করে লক্ষ করেছিস?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, চৌকোমতো, বেশ উঁচু।'

'হ্যাঁ, কিন্তু বেদি বানাতে মাটি বা ইটের দরকার হয়। এই জঙ্গলে তো ইটের জোগাড় নেই, আর আশপাশে কোথাও মাটি কাটার দাগও ছিল না। মনে হচ্ছে গোটাদুই বাক্সর উপর চট আর কম্বল দিয়ে ঢেকে বেদি করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, বাক্সটা কিসের। আরও কথা আছে।'

নবা অবাক হয়ে বলে, 'আরও কী কথা ওস্তাদ?'

'আমি, তুই, জটাবাবা আর হিজিবিজি ছাড়া এই ঘরে আরও একটা কেউ ছিল।'

'কই ওস্তাদ, আর তো কাউকে দেখলুম না।'

'সব জিনিস কি চোখে দেখা যায় রে, তবে আন্দাজ পাওয়া যায়। আমি পাঁচ জনের শ্বাসের শব্দ পেয়েছি। রাতের অন্ধকারে যখন অচেনা বাড়িতে অন্ধকারে ঢুকতে হয়, তখন চোখ ততটা কাজ করে না, কিন্তু চোখের জায়গা নেয় কান। বুঝলি? তোর অবশ্য নাক, কান, চোখ, সবই সমান, সবক'টাই ভোঁতা।'

নবা লজ্জা পেয়ে বলে, 'তা বটে ওস্তাদ, কিন্তু ওই পাঁচ নম্বর লোকটা কে?'

'লোক কিনা তা জানি না! পাঁচ নম্বর যে মানুষই হবে এমন কোনও কথা নেই।'

নবা শশব্যস্তে বলে, 'তার মানেটা কী দাঁড়াচ্ছে ওস্তাদ?'

'পাঁচ নম্বরের শ্বাসের শব্দটা একটু অন্যরকম, অনেকটা খুব আস্তে শিষ দেওয়ার শব্দের মতো। আর শ্বাসটা অনেকক্ষণ বাদে-বাদে ছাড়ে।'

'সাপখোপ নয়তো!'

'না। দেশের সব সাপের শ্বাস আমার জানা। এ অন্য কিছু, মানুষ হলেও অন্যরকম মানুষ। শোন, জটাবাবার কাছে এসেছিলাম নিজের পাপ কবুল করে মন্তর নেব বলে, কিন্তু এখন অন্য কথা ভাবছি। জটাবাবা বোধহয় আমার চেয়েও এককাঠি উপরের জিনিস, সুতরাং এখনও রিটায়ার করলে আমার চলবে না, ব্যাপারটা দেখতে হবে।'

চার

হাই বড় ছোঁয়াচে জিনিস। সামনে বসে যদি কেউ বড়-বড় হাঁ করে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড হাই তুলতে থাকে, তা হলে তা দেখে সুমুখের মানুষটারও হাই উঠবেই কি উঠবে। নইলে এই সন্ধে সাড়ে সাতটার সময় হাই তোলার মানুষ শিবেন নয়। কিন্তু উদ্ধববাবুর নাতি, সাঁঝঘুমোনি নাতি গোবিন্দকে সন্ধেবেলা পড়াতে এলে শিবেনের এই ফ্যাসাদটা হয়। গোবিন্দ যখন পড়তে বসে, তখনই তার ঢুলুঢুলু অবস্থা। প্রথম অঙ্কটা হয়তো কোনওরকমে কষল, শিবেন সেটা যখন দেখছে, তখনই গোবিন্দ টেবিলে মাথা রেখে ঘুমে তলিয়ে গেছে। তাকে ডেকে-হেঁকে-ঝাঁকিয়ে, কাতুকুতু দিয়ে দ্বিতীয় অঙ্কটা করাতে বসালে গোবিন্দ অঙ্কের মাঝখানেই হাই তুলতে-তুলতে বারকয়েক ঢুলে পড়ে। আর তখন শিবেনেরও হাই ওঠে, ঢুলুনি আসে। তিন নম্বর অঙ্কে পৌঁছতে তাই অনেক সময় চলে যায়। গোবিন্দর ঘুম তাড়ানোর জন্য বাড়ির লোকও কম চেষ্টা করেনি। প্রথমে একজন ঢাকিকে আনানো হয়েছিল। কিন্তু ঢাকের বিকট শব্দে পাড়াপ্রতিবেশিরা অতিষ্ঠ হয়ে থানা-পুলিশ করবে বলে জানায়। তা ছাড়া গোবিন্দর ঘুম ঢাকেরও তোয়াক্কা করেনি বলে ঢাকের বদলে লঙ্কা পোড়া দিয়ে পড়ার ঘরে ধোঁয়া দেওয়া হল। তাতে গোবিন্দ যেমন নাকাল, তার চেয়েও বেশি নাকাল হল বাড়ির লোকেরা। সবাই হেঁচে-কেশে অস্থির। তারপর চোখে সর্ষের তেল, ঠান্ডা জলের ঝাপটা ইত্যাদি অনেক কিছুই করা হয়েছে। কিন্তু গোবিন্দর ঘুম

তাতে নড়ার নামটিও করেনি। ওই ঘুমের জন্যই গোবিন্দর জনাসাতেক প্রাইভেট টিউটর কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে গেছে। তবে শিবেন ধৈর্যশীল মানুষ এবং ডাকাবুকো লোক। ময়নাগড়ে নতুন এসেছে ইশকুলে মাস্টারির চাকরি নিয়ে। তিন মাসেই লোকে জেনে গেছে শিবেনের অঙ্কের মাথা খুব পাকা, তাই তাকে নিয়ে ছাত্তরমহলে কাড়াকাড়ি। উদ্ধববাবু অনেক বেশি টাকা কবুল করে তাকে নিজের অপোগণ্ড নাতি গোবিন্দর জন্য নিয়োগ করেছেন। বলেছেন, 'বাপু হে, আশি-নব্বই নয়, অঙ্কে তিরিশটি নম্বর জোগাড় হলেই আমি খুশি।' দু-মাস হল শিবেন লেগে আছে। গোবিন্দর তেমন কোনও উন্নতি হয়েছে বলে তার মনে হচ্ছে না। অঙ্কের উন্নতি না হলেও, দিন-দিন যে গোবিন্দর ঘুমের উন্নতি হচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই।

আজ অবিশ্যি গোবিন্দ পড়তে এসেই হাই তুলে বলল, 'জানেন মাস্টারমশাই, আজ দাদু ভূত দেখেছে।'

শিবেন ভূতে বিশ্বাসী নয়, কৌতূহলও নেই। অঙ্কের বইয়ের পাতা ওলটাতে-ওলটাতে আনমনে শুধু বলল, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ মাস্টারমশাই, লম্বা, ফরসা, ম্যাজিশিয়ান ভূত!'

'বটে! ভূত আবার ম্যাজিশিয়ানও হয়, কখনও শুনিনি তো!'

গোবিন্দ তিন মিনিটের একটা ঢুলুনি সামলে নিয়ে বলল, 'তাকে পাঁচুও দেখেছে। তার নাম হিজিবিজি।'

এতক্ষণ এসব কথায় তেমন গা করেনি শিবেন। এবার হঠাৎ চমকে উঠে বলল, 'কী নাম বললে?'

গোবিন্দ পাক্কা পাঁচ মিনিট অঘোরে ঘুমিয়ে নিয়ে তারপর ঢুলুঢুলু চোখে চেয়ে বলল, 'ওঃ হ্যাঁ, তার নাম হিজিবিজি।'

শিবেনের মুখটা একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ। খানিকক্ষণ গোবিন্দর টেবিলের উপর নোয়ানো মাথাটার দিকে চেয়ে থেকে আপন মনেই বিড়বিড় করে বলল, 'তা হলে কি সন্ধান পেয়েছে?'

ঠিক এই সময় উদ্ধববাবু ঘরে ঢুকে খুবই উদ্বেগের গলায় বলে উঠলেন, 'সন্ধান পাবে কী করে হে! সে কি মনিষ্যি, যে সন্ধান পাবে?'

শিবেন থমতম খেয়ে কী বলবে ভেবে না পেয়ে শুধু বলল, 'যে আজ্ঞে!'

উদ্ধববাবু চোখ গোল-গোল করে বললেন, 'বললে বিশ্বাস হবে না ভায়া, জলজ্যান্ত দিনেদুপুরে ভূত এসে হাজির হয়েছে। কী বিপজ্জনক পরিস্থিতি বলো তো! এরকম চলতে থাকলে তো ময়নাগড় একেবারে ভূতের বৃন্দাবন হয়ে উঠবে!'

শিবেন একটু উদ্বেগের গলায় বলল, 'তাকে আপনি কোথায় দেখেছেন?'

'সকালবেলায় বাজারে যাওয়ার পথে, তেঁতুলতলায়। কী বলব ভায়া, তার সঙ্গে যে কিছুক্ষণ খোশগপ্পও করেছি। ভূত বলে ঘুণাক্ষরেও বোঝা যায়নি। রঙ্গ-রসিকতাও করছিল। দিব্যি সুন্দরপানা লম্বা-চওড়া চেহারা, তার ওপর দিনমানের আলোয় দেখা। ভূত বলে মনে হওয়ার কারণও ছিল না। কথা কইতে-কইতে হঠাৎ গায়েব হয়ে যাওয়াতেই বুঝলাম যে, সে ভূত।'

শিবেন একটু গম্ভীর হয়ে বলে, 'গোবিন্দ বলছিল, লোকটা নাকি ম্যাজিশিয়ান!'

'তা বলছিল বটে! কিন্তু তার কোন কথাটা সত্যি, আর কোন কথাটা মিথ্যে, তা কে বলবে'!'

'ম্যাজিশিয়ানরা অনেক কৌশল জানে। ভ্যানিশ হয়ে যাওয়া তার একটা কৌশলও হতে পারে।'

'আহা, ওসব স্টেজে হয়। কিন্তু দিনেদুপুরে একটা লোকের হঠাৎ হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়া তো আর চাট্টিখানি কথা নয়!'

'উন্নততর প্রযুক্তি আর কৌশলে সবই সম্ভব।'

উদ্ধববাবু একটা চেয়ার টেনে শিবেনের পাশে বসে গলা নামিয়ে বললেন, 'বাপু হে, তুমি তো সায়েন্সের লোক, অনেক জানোটানো, তা হলে কি বলতে চাও, লোকটা আমার চোখে ধুলো দিয়েছে?'

শিবেন একটু হেসে বলল, 'সেটাই সম্ভব। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। ভূতপ্রেত মানি না। আপনি যাকে দেখেছেন তাকে ভূত বলে মনে হচ্ছে না। তবে সে কোনওভাবে একটা অপটিক্যাল ইলিউশন তৈরি করেছিল। উন্নততর প্রযুক্তির সাহায্যে সেটা সম্ভব হতেও পারে।'

'তা হলে কি লোকটা আমাকে ম্যাজিক দেখিয়ে বোকা বানাল?'

'আমার অন্তত তাই মনে হচ্ছে।'

'দাঁড়াও বাপু, দাঁড়াও। ছোকরা আমাকে কিছু কথা বলেছিল।'

শিবেন হঠাৎ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বলল, 'কী কথা?'

'বলেছিল, তাকে নাকি কিছু লোক খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে সেইজন্য গা-ঢাকা দিয়ে থাকার জায়গার সন্ধানে ময়নাগড়ে এসে হাজির হয়েছে। যারা খুঁজছে জিগ্যেস করায় সে পুলিশ, মিলিটারি আর ইন্টারপোলেরও নাম করেছিল। এখন ভাবছি, ভূত হলে পুলিশটুলিসের তো তাকে খোঁজার কথা নয়।'

শিবেন একটু নিভে গিয়ে বলে, 'যে আজ্ঞে!'

'তোমার কি মনে হয় বলো তো ভায়া, লোকটা ভূত না উঁচুদরের ধাপ্পাবাজ?'

শিবেন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'ভূত নয় বলেই জানি। তবে ধাপ্পাবাজ কিনা তা জানি না।'

'আমি বুড়োমানুষ, চোখের ভুল হলেও হতে পারে। কিন্তু পাঁচু তো আর বুড়ো নয়। সেও তো দেখেছে।'

'পাঁচু কে বলুন তো?'

'সে তুমি চিনবে না। গাঁয়ের ছেলে, নিষ্কর্মা।'

'বিশ্বাসবাড়ির বোকাসোকা ছেলেটা নাকি?'

'হ্যাঁ, সে-ই।'

'পাঁচু মাঝে-মাঝে আমার কাছে আসে। তাকে চিনি। আপনারা দুজন ছাড়া আর কেউ দেখেছে লোকটাকে?'

মাথা নেড়ে উদ্ধববাবু বললেন, 'দেখলেও কেউ কবুল করেনি। তবে সে যখন এখানে থানা গেড়েছে তখন অনেকেই দেখবে।'

শিবেন খুব চিন্তিত হয়ে বলল, 'হুঁ।'

'তা হলে ভয়ের কিছু নেই বলছ তো! সায়েন্সের লোকেরা ভরসা দিলে আমরা একটু জোর পাই। এই তো সেদিন নরহরি ঘোষ বলল, সায়েন্সে নাকি বলেছে, শনিপুজোর সিন্নি খেলে নাকি ম্যালেরিয়া সেরে যায়। কারণ, তাতেই শনির তেজস্ক্রিয়তা এসে ঢুকে এমন ভজঘট্ট পাকিয়ে তোলে যে, ম্যালেরিয়া পালানোর পথ পায় না।'

'বলেছে বুঝি?'

'নরহরি সায়েন্সের মেলা খবরটবর রাখে। এই গাঁয়ে বিজ্ঞানের সলতেটা ও-ই জ্বালিয়ে রেখেছে কিনা! অ্যাটম বোমা জিনিসটা কী তা নরহরিই তো একদিন জলের মতো বুঝিয়ে দিল আমাদের।'

'বটে!'

'তবে আর বলছি কী। বলল, অ্যাটম নাকি পোস্তদানার চেয়ে ছোটও জিনিস। তবে ভারী তেজি, লম্বা মতো একটা নলের মধ্যে ভরে খুব ঠেসে দিতে হয়, তারপর এরোপ্লেনে উঠে পলতেয় আগুন দিয়ে ফেলে দিতে হয়। যখন ফাটে তখন নাকি দেখবার মতো জিনিস। আমাদের কাশেমের চরে নাকি অ্যাটমের খনি আছে। বস্তা-বস্তা অ্যাটম চালান যাচ্ছে বিদেশে। অ্যাটম বেচেই তো কাশেম লাল হয়ে গেল।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শিবেন বলল, 'নরহরিবাবু খুবই জ্ঞানী লোক দেখছি।'

এমনিতে নরহরি লোক সুবিধের নয়, বুঝলে। ভারী ঝগড়ুটে, বিশ্বনিন্দুক, হাড়কেপ্পন। কিন্তু বিজ্ঞানটা জানে ভাল। ইশকুলের সায়েন্সের মাস্টারমশাই বিষ্টুবাবু পর্যন্ত ওর সামনে দাঁড়াতে পারেন না। ইস্কুলে সেদিন মাধ্যাকর্ষণ বোঝাতে গিয়ে নিউটনের সেই গাছ থেকে আপেল পড়ার বৃত্তান্ত বলছিলেন বিষ্টুবাবু। তা নরহরি সেদিন চণ্ডীমণ্ডপে বসে বলছিল, বিষ্টুবাবু অর্ধেকটা জানেন, বাকি অর্ধেকটা জানেন না। আপেলটা পড়েছিল ঠিকই, তবে সেটা পড়েছিল নিউটনের মাথায়। বিলেতের আপেল, সাইজেও এক-একটা তালের মতো। মাথায় পড়াতে নিউটনের ঘিলু চলকে গিয়ে দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়, আর তাইতেই মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করে ফেলেন। তবে নরহরি এ-কথাও বলেছে, মাধ্যাকর্ষণের আসল ব্যাপারটা খুব গুহ্য কথা, এখনও বিজ্ঞানীরা সব চেপেচুপে রেখেছেন। কয়েক বছর পর তা প্রকাশ পাবে।'

শিবেন অবাক হয়ে বলে, 'সে কথাটা কী?'

উদ্ধববাবু গলা খাটো করে বললেন, 'আগে নাকি মাধ্যাকর্ষণ বলে কিছু ছিল না, তখন মানুষ, গরু, কুকুর, ছাগল মায় গাছপালা অবধি গ্যাসবেলুনের মতো ভেসে-ভেসে বেড়াত, তারপর উঁচুতে উঠতে-উঠতে স্বর্গে গিয়ে ঠেকত। তাইতে স্বর্গের লোকেরা ভারী জ্বালাতন হয়ে উঠল। স্বর্গে গাদাগুচ্ছের মানুষ, গোরু, ছাগল ঢুকে পড়ায় বিশৃঙ্খল অবস্থা। ওদিকে পৃথিবী ফাঁকা পড়ে আছে। সৃষ্টি রসাতলে যাচ্ছে। তখন নাকি সৃষ্টি বাঁচাতে ব্রহ্মা একটা রাক্ষুসে চুম্বক মাটির নীচে পেতে দিলেন। ব্যাস, সেই থেকে সব আমরা আটকে আছি।'

'এটাও কি সায়েন্সে বলেছে?'

'তবে? নরহরির কাছে পুঁথিখানা আছে, খুব গুপ্ত পুঁথি। সাহেবদেরই বই, তবে বাংলায় লেখা। খালাসপুরের হাটে যুধিষ্ঠির দাস নামে যে লোকটা বইপত্র বেচতে আসে, তার কাছ থেকে মেলা ঝোলাঝুলি করে কেনা, দু-টাকার বই দশ টাকায় রফা হয়েছে।'

শিবেনের ফের দীর্ঘশ্বাস পড়ল। সে মিনমিন করে বলল, 'সাহেবরা বাংলা বই লিখতে যাবে কেন সেটাই বুঝতে পারছি না।'

উদ্ধববাবু গলাটা আরও খাটো করে বললেন, 'আহা, এটা না বোঝার কী আছে হে বাপু! ইংরিজিতে লিখলে অন্য সব সাহেবরা জেনে যাবে যে! বাংলায় লিখলে জিনিসটা লেখাও হয়ে রইল, গোপনও থাকল। বড়-বড় দোকানে ও বই পাবে না, গাঁয়েগঞ্জে খুব গোপনে দু-চারজন বিক্রি করে।'

একটু আগে গোবিন্দর হাই তোলা দেখে শিবেনেরও হাই উঠেছিল। ঘুম-ঘুম ভাবটাও বেশ চেপে ধরেছিল তাকে। এখন এসব বৃত্তান্ত শুনে ঘুম পালিয়েছে বটে, কিন্তু দীর্ঘশ্বাসের পর দীর্ঘশ্বাস পেয়ে বসেছে শিবেনকে। দীর্ঘশ্বাসকে চেপেচুপে ছোট করাতে কিছুতেই পেরে উঠছে না সে। মাথাটাও একটু-একটু ঘুরছে। সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'এবার তা হলে আসি উদ্ধববাবু?'

'আহা, আটটা দশ মিনিট বাজছে যে! এ সময়ে বেরোতে আছে?'

অবাক হয়ে শিবেন বলে, 'আটটা দশ মিনিটে বেরোলে কী হয়?'

'তুমি যে জমিদারবাড়ির খাজাঞ্চিখানায় থাকো। ওর কাছেই তো পদ্মঝিল। এ সময়ে কলসি-কানাই ঝিল থেকে উঠে তার বউ-বাচ্চাকে দেখতে যায় যে।'

শিবেন হাঁ করে চেয়ে থেকে বলল, 'কলসি-কানাইটা আবার কে?'

উদ্ধববাবু খুব বিজ্ঞের মতো হেসে বললেন, 'তাও জানো না তুমি! কলসি-কানাই সম্পর্কে বেশি না বলাই ভালো। নতুন এসেছ এই গাঁয়ে, ভয়টয় পাবে। তবে মোদ্দা কথা হল, রাত আটটা থেকে ন'টার মধ্যে পদ্মঝিলের দিকটায় না যাওয়াই ভালো, বলা তো যায় না!'

শিবেন একটু হেসে বলল, 'ভূত নাকি? আপনাকে তো বলেইছি, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, ভূতটুত মানি না।'

'ওরে বাপু, ভূতেরও বিজ্ঞান আছে, নাকি? নইলে ভৌতবিজ্ঞান হল কী করে?'

'আজ্ঞে, ভৌতবিজ্ঞান অন্য জিনিস। সেটা ভৌতিক বিজ্ঞান নয়।'

'ওপর-ওপর বোঝা যায় না হে! তলিয়ে পড়লে দেখবে, ওর মধ্যেই ঠারেঠারে ভূতের বৃত্তান্ত গোঁজা আছে।'

'আজ্ঞে সেটাকেই বোধহয় গোঁজামিল বলে।'

'বিজ্ঞানেই তো বাপু পঞ্চভূতের কথা আছে।'

শিবেন বেশ বিনয়ের সঙ্গেই বলল, 'তা বটে! তবে সেই ভূত কিন্তু প্রেতাত্মা নয়।'

'মিলেমিশে থাকে হে, টক করে বোঝা যায় না। একটোপ্লাজম কী জিনিস জানো?'

'আজ্ঞে না।'

'ভূত হল ওই জিনিস দিয়ে তৈরি, যদ্দুর শুনেছি, এক চামচ ক্ষিতি, দেড়চামচ অপ, এক চিমটি তেজ, এক খাবলা মরুৎ, আর খানিকটা ব্যোম মিশিয়ে তার মধ্যে একটু ফসফরাস ঘষে দিলেই একটোপ্লাজম তৈরি।'

শিবেন উঠে হাতজোড় করে বলল, 'বড্ড রাত হয়ে যাচ্ছে উদ্ধববাবু, আজ আমি আসি গিয়ে। শরীরটা একটু কাহিল লাগছে।'

'যাবে! তা ঝিলের ধারের রাস্তায় না গিয়ে বাবুপাড়ার রাস্তা দিয়ে যেও।'

'যে আজ্ঞে!' বলে শিবেন বেরিয়ে পড়ল।

সন্ধের পর ময়নাগড় ভারী ভয়ের জায়গা, কারণ শীতকালের দিকটায় আশেপাশে চিতাবাঘের খুব উৎপাত। তা ছাড়া উত্তরের জঙ্গলে যেসব ভালুকের কথা শোনা যায়, তারাও বিশেষ ভালমানুষ নয়। বাগে পেলে লম্বা নখ আর দাঁতে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। মাঝে-মাঝে হাতির পালও বোরোয়। নেকড়ে বাঘ বা বুনো কুকুরের দৌরাত্ম্যের কথাও খুব শোনা যায়। কাজেই সন্ধের পর ময়নাগড় ভারী শুনশান জায়গা। পথে লোকের চলাচল নেই বললেই হয়। সন্ধে সোওয়া আটটায় যেন নিশুতি রাত নেমে এসেছে।

প্রচণ্ড ঠান্ডাতেও শিবেনের মাথাটা আজ গরম। ভূতপ্রেতে সে বিশ্বাসী নয় ঠিকই, কিন্তু যে বিপদের আঁচ সে পেয়েছে, তাতেই বুক ধকধক করছে, মনে উদ্বেগ, রাস্তায় পা দিয়ে সে অত্যন্ত দ্রুতবেগে হাঁটছিল। গাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তার নগেন সরখেলের চেম্বারে গাঁয়ের প্রবীণদের একটা সান্ধ্য জমায়েত হয়। বাঁদুরে টুপি, সোয়েটার, চাদরে জাম্বুবান হয়ে সব বসে আছে। আর ভিতর থেকে হরগোবিন্দ ঘোষাল মুখ বাড়িয়ে হেঁকে বলল, 'কে হে, শিবেন নাকি?'

'যে আজ্ঞে।'

'দাঁড়াও বাপু, দাঁড়াও। কখন থেকে বাড়ি যাব বলে একজন সঙ্গী খুঁজছি, তা ওইখানে যাওয়ার কেউ নেই আজ। বুড়োমানুষ, তার উপর পাঁচু খবর দিয়ে গেল বাঁশতলার কাছে, রামহরির বাড়ি থেকে তার বাছুরটাকে আজ সন্ধেবেলায় চিতাবাঘে নিয়ে গেছে।'

বাধ্য হয়ে দাঁড়াতে হল শিবেনকে। যদিও মনটা উচাটন, কিন্তু গাঁয়ে থাকতে গেলে সকলের সঙ্গে সমঝোতা থাকা ভালো।

হরগোবিন্দ ঘোষাল সঙ্গ ধরে বলল, 'ওই উদ্ধবের নাতি গোবিন্দর পিছনে বাপু তুমি বৃথাই আয়ুক্ষয় করছ। গোবিন্দর ঘুম কেউ ভাঙাতে পারবে না। তার চেয়ে তুমি বরং আমার নাতি বলাইকে পড়াও। গত বার্ষিক পরীক্ষাতেও অল্পের জন্য অঙ্কের লেটার মার্ক ফসকে গেছে। তুমি হাতে নিলে একশোতে একশো পাবে।'

'বলাই অঙ্কে কত পেয়েছিল?'

'ওই তো বললুম, লেটার মার্কটা পেয়েও পেল না। সরল অঙ্কটা সব ঠিকঠাক করেও উত্তরের জায়গায় শূন্যের বদলে নাকি এক লিখেছিল। আসলে লিখেছিল শূন্যই, কিন্তু তাড়াহুড়োয় কলমের খোঁচা লেগে শূন্যের মাথায় একটা টিকি বসে যায়। তাইতেই দশ-দশটা নম্বর পিছলে গেল। চৌবাচ্চার অঙ্কেও তাই, সব ঠিকঠাক করে শেষ লাইনে কী একটা গণ্ডগোল, গেল দশটা নম্বর। কপালের ফেরে অ্যালজেবরাতেও এক্স লিখল, মাস্টারমশাই সেটা ওয়াই ভেবে দিলেন ঘ্যাচাং করে নম্বর কেটে। কপালের ফের রে ভাই! জ্যামিতির কথা শুনবে? যতবার ত্রিভুজ আঁকতে যায়, পেনসিলের শিস যায় ভেঙে। ফের পেনসিল কেটে শিস বার করতে-করতে ঘণ্টা পড়ে গেল। যাই হোক, লেটার মার্ক ফসকালেও নম্বর খুব একটা খারাপ নয়। আটত্রিশ, একটু ধরিয়ে মকশো করে দিলে, ওই আটত্রিশ অষ্টাশি হতে লহমাও লাগবে না।'

'আমি যতদূর জানি, বলাই বার্ষিক পরীক্ষায় অঙ্কে তেইশ পেয়েছিল।'

'আহা, খাতায়-কলমে তেইশ হলেও, যে অঙ্কগুলো ঘণ্টা পড়ে যাওয়ায় করতে পারেনি, সেগুলো ধরলে আটত্রিশ কেন, একটু বেশিই দাঁড়ায়। স্কুলের পরীক্ষায় আর ক'টা ছেলের ঠিকঠাক অ্যাসেমেন্ট হয় বলো!'

'তা অবিশ্যি ঠিক।'

বলে শিবেন ফের দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

হরগোবিন্দ ঘোষাল গলাটা একটু নামিয়ে বলল, 'বাপু হে, তুমি যে কেন জমিদারবাড়ির খাজাঞ্চিখানায় পড়ে আছ তা বুঝি না। ও হল হানাবাড়ি, আজ বিশ-পঁচিশ বছর হল ও বাড়িতে কেউ থাকে না। শুধু বুড়ো শ্যামাচরণের তিন কুলে কউ নেই বলে নাচার হয়ে পড়ে আছে। সে অবিশ্যি ওই বাড়িতেই সারাজীবন কাটিয়েছে বলে মায়ার টানও হয়তো একটু আছে। কিন্তু কাজ কী তোমার ওই ভুতুড়ে বাড়িতে পড়ে থেকে? বরং আমার বাড়িতে চলে এসো। বাইরের বাগানের দিকটায় দুই নাতি কানাই আর বলাইয়ের জন্য পড়ার ঘর করেছি। দিব্যি বড়সড় ঘর। তার একধারে চৌকি পেতে দিব্যি থাকবে। দু-বেলা আমাদের সঙ্গেই দুটি খেও। কোনও অসুবিধে হবে না। ওই সঙ্গে কানাই, বলাইকে ঘমেমেজে একটু মানুষ করে দাও।'

শিবেন হেসে বলে, 'আজ্ঞে, আপনার প্রস্তাব তো খুবই ভাল! তবে কিনা আমার খাজাঞ্চিখানায় থাকতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। ভূতের ভয় আমার নেই। জায়গাটা নিরিবিলি বলে আমার লেখাপড়ারও একটু সুবিধে হয়।'

হরগোবিন্দ ভারী অবাক হয়ে বলল, 'লেখাপড়া? মাস্টার হয়ে আবার লেখাপড়া কিসের? বলি, লেখাপড়া শেষ করেই তো লোকে মাস্টার হয়! তারপরও কেউ লেখাপড়া করে নাকি? তা হলে আর জীবনে সুখ কী রইল বলো?'

'কেন, লেখাপড়ার মধ্যে কি সুখ নেই?'

'দূর দূর! কী যে বলো ভায়া! লেখাপড়ার মধ্যে আবার সুখের কি দেখলে? শুকনো বই খুলে বসে থাকার কোনও মানে হয়? সময় নষ্ট, আয়ু ক্ষয়, শিরঃপীড়া, চোখে ছানি আসবে, আমার বাড়িতে গেলে দেখবে নাতিউতিদের পড়ার বই ছাড়া বই বলতে আছে শুধু একখানা পঞ্জিকা, একখানা লক্ষ্মী আর একখানা সত্যনারায়ণের পাঁচালি আর একখানা কাশীদাসী মহাভারত। আর বইপত্রের নামগন্ধও নেই। বই পড়া মানে তো সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা ছাড়া কিছু নয়। এই আমাকেই দ্যাখো না কেন, ইশকুলের গণ্ডিটা ডিঙিয়েই ও পাট চুকিয়ে দিয়েছি। সকালে উঠে একটু হরিনাম নিয়েই গো-সেবায় লেগে পড়ি। তারপর চাট্টি মুড়িটুড়ি খেয়ে বাজারে যাই। দুপুরে চাট্টি খেয়েই লম্বা দিবানিদ্রা। বিকেলে একটু বাগানের কাজ, তারপর আড্ডা। এই এখন বাড়িতে ফিরে খেয়েদেয়ে লেপের তলায় ঢুকে যাব। একঘুমে ভোর, দিব্যি আছি।'

শিবেন মাথা নেড়ে বলে, 'তাই বটে, তবে আমার একটু লেখাপড়ার বাই আছে।'

হরগোবিন্দ কৌতূহলী হয়ে বলল, তা কী বই পড়ো তুমি? নাটক, নভেল, নাকি গুপ্তবিদ্যাটিদ্যা কিছু?'

'আজ্ঞে না। আমি হায়ার ম্যাথামেটিক্স আর বিজ্ঞানের বই পড়ি।'

'ওরে বাবা! শুনেছি অঙ্কের বই নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে হাঁফানি আর শ্লেষ্মার দোষ হয় আর বিজ্ঞান নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করাও নাকি ভালো কথা নয়। ওতে লোকে নাস্তিক হয়। আর তাতে ঠাকুর-দেবতারা ভারী কুপিত হয়ে ওঠেন।'

শিবেন শান্ত গলায় বলে, 'বইটই না পড়লে জ্ঞান হবে কী করে? জ্ঞানই তো মানুষের মস্ত সম্পদ।'

ঘোষাল একটু ভাবিত হয়ে বলল, 'সেকথাও মিথ্যে নয়। জ্ঞান খুব দামি জিনিসই হবে। তবে কি জানো বাপু, বেশি জ্ঞানই কি ভালো? এই যে আমাদের মন্মথবাবু বিদ্যে একেবারে গুলে খেয়ে বসে আছেন। তা তাঁর কি তাতে শান্তি আছে? পেটে বিদ্যে আছে বলে রাজ্যের লোক তাঁর কাছে দরখাস্ত লেখাতে আসে। নানা জটিল জিনিস সরল করে বুঝতে হাজির হয়। একদিন তো শুনলুম, কোথাকার একটা উটকো লোক এসে

তেঁতুলবিচিকে কেন কাঁইবিচি বলা হয় তাই নিয়ে সকাল থেকে দুপুর অবধি তর্ক করে গেল।'

শিবেন হতাশ হয়ে বলল, 'আপনি দেখছি লেখাপড়া বিশেষ পছন্দ করেন না! তা হলে আর নাতিকে বিদ্বান করতে চাইছেন কেন?'

হরগোবিন্দ বলল, 'আহা, বিদ্যে কি আর খারাপ জিনিস? তা তো আর বলিনি হে বাপু। বলছি কোনও জিনিসের বাড়াবাড়ি কি ভালো? পড়ার বয়সে না হয় একটু পড়লে-টড়লে, কিন্তু তারপর পাশটাস করে চাকরিতে ঢুকে গেলে আর ওসবের দরকারটা কী? তা, সে কথা থাক। তুমি তা হলে ওই খাজাঞ্চিখানাতেই থাকবে বলে মনস্থ করেছ তো!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, জায়গাটা ভারী ভালো। যেমন বড় ঘর, তেমনই ভারী নিরিবিলি।'

'তা বটে, তবে কিনা ওই খাজাঞ্চিখানাতেই নগেন পোদ্দার গলায় ফাঁস দিয়ে মরেছিল।'

'নগেন পোদ্দার কে বলুন তো?'

'সে অবশ্য চল্লিশ বছর আগেকার কথা। খাজাঞ্চিখানায় খাতা লিখত নগেন পোদ্দার। জমিদার প্রসন্ন রায়ের আমল। নগেন পোদ্দারের মতো অমন হাড়কেপ্পন লোক আর ভূভারতে নেই। চেহারাখানাও হাড়গিলে শকুনের মতো। সর্বদা চারিদিকে শ্যেণদৃষ্টি। এক পয়সা ফাদার-মাদার। কোথাও কাঙালিভোজন হচ্ছে খবর পেলেই সেখানে গিয়ে পেটপুরে খেয়ে আসত। খেয়ে না-খেয়ে এক কলসি টাকা জমিয়েছিল। একদিন সেই টাকা কলসি সমেত চুরি যায়। টাকার শোকে নগেন প্রথমে পাগল হয়ে গেল, তারপর পাথর। চুপচাপ বসে বিড়বিড় করত। তারপর এক রাতে ফাঁসিতে ঝুলে পড়ল। তার প্রেতাত্মা সেই টাকার কলসি খুঁজে বেড়াত, অনেকেই দেখেছে। তাই বলছিলাম ভায়া, খাজাঞ্চিখানা জায়গাটা এমনিতে মন্দ নয় বটে, তবে কিনা—'

'আমি তো বলেইছি, আমার ভূতপ্রেতে বিশ্বাস নেই, ভয়ও নেই।'

'তারপর ধরো, শীতকালটা খারাপ কিছু নয়। কিন্তু গরম পড়লেই দেখবে, আনাচকানাচ থেকে বিষধর সব চক্করওয়ালা লতানে জিনিস বেরিয়ে আসবে। গোখরো, চন্দ্রবোড়া, কালাচ, কেউটে, কী নেই সেখানে। চারধারে কিলবিল করে বেড়াবে।'

'কই, আমি তো তেমন সাপখোপ দেখতে পাইনি কখনও।'

'আহা, তার কি আর সময় গেছে! গতবার দ্যাখোনি তো কী হল! এবারেই হয়তো দেখবে। তাই বলছিলাম, কাজ কী তোমার ওই বিপদের মধ্যে থেকে?'

শিবেন হেসে বলল, 'বিপদ ঘটলে তখন দেখা যাবে।'

হরগোবিন্দ ঘোষাল নিজের বাড়ির মোড়টায় এসে বলল, 'চলি হে ভায়া, যা বললুম একটু ভেবে দেখো, আখেরে তোমার লাভই হবে।'

শিবেন জবাব না দিয়ে হাঁটা ধরল।

জমিদার বাড়িটা বিশাল বাগান দিয়ে ঘেরা। বাগানের পাঁচিল অনেক জায়গায় ভেঙে পড়েছে। বাগানে আগাছাও বিস্তর।

ফটক থেকে অনেকটা ভিতর দিকে, অন্ধকারে পুরোনো বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। প্রাসাদ না হলেও বাড়িখানা পেল্লায় বড়। এখন আর কেউ এখানে থাকে না। বুড়ো শ্যামাচরণই একমাত্র পড়ে আছে, যাওয়ার জায়গা নেই বলে।

ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকে বাঁ-ধারে পুকুরের পুব ধারে ব্যারাকের মতো একটা লম্বা দালানই হচ্ছে খাজাঞ্চিখানা। শিবেন টর্চ জ্বেলে দেখল, তার ঘরের সামনে বারান্দায় শ্যামাচরণ একখানা চাদরে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে আছে।

'এ কী শ্যামাদা, তুমি এখানে বসে আছ যে!'

'আর বোলো না, তোমার ঘরে যে আজ সন্ধেরাতে চোর ঢুকেছিল!'

শিবেন চমকে উঠে বলল, 'চোর! বলো কী!'

'রোজ সন্ধেবেলা আমি একটু হরিনাম শুনতে বিষ্ণুমন্দিরে যাই, সবাই জানে। আজ একটু শরীরটা রসস্থ হওয়ায় যাওয়া হয়ে ওঠেনি। ঠাকুর দালানে পিদিম জ্বেলে দিয়ে ঘরে ফেরার সময় হঠাৎ দেখি দু-দুটো লোক তোমার ঘরের দরজার তালা খোলার চেষ্টা করছে। হাঁক করতেই অবশ্য দুদ্দাড় করে পালিয়ে গেল। কিন্তু লক্ষণটা ভালো ঠেকল না। ময়নাগড়ের সব চোর আমার চেনা। আবছা অন্ধকারে দেখা বটে, কিন্তু এরা এখানকার লোক নয়। এ তল্লাটের চোর এ বাড়িতে হানা দেবে না। বলি, দামি জিনিস-টিনিস কিছু রেখেছ নাকি ঘরে?'

শিবেন আমতা-আমতা করে বলে, 'না, না, দামি জিনিস আর কী থাকবে আমার ঘরে! শুধু বইপত্র আর খাতা-কলম।'

তালাটা চোরেরা খুলে ফেলেছে, তবে ঘরে ঢুকেছে বলে মনে হয় না। আমি সেই থেকে বসে তোমার ঘর পাহারা দিচ্ছি। আগে ঘরে ঢুকে হ্যারিকেনটা জ্বেলে দ্যাখো তো কিছু খোয়া গেছে কিনা।'

শিবেন দরজার তালাটা পরীক্ষা করে দেখল, সেটা কেউ হ্যাক স' দিয়ে কেটে ফেলেছে। মুখটা শুকিয়ে গেল তার। ঘরে ঢুকে কাঁপা হাতে হ্যারিকেন জ্বেলে দেখল, ঘরের জিনিস সব ঠিকঠাকই আছে।

শ্যামাচরণ পিছু-পিছু ঘরে ঢুকে বলল, 'ভালো করে দেখেছ?'

'কিছু চুরি যায়নি বলেই মনে হচ্ছে।'

'বিপদ কী জানো, সন্ধেবেলাটায় তুমি পড়াতে যাও, আমি যাই হরিকীর্তনে। বাড়িটা ফাঁকা থাকে। চোর যদি আবার আসে, তবে ঠেকাবে কে?'

শিবেন বিপন্ন গলায় বলে, 'তাই তো ভাবছি।'

তুমি মাস্টার মানুষ, ছেলে পড়িয়ে খাও, শেঠিয়া লোক তো নও। তবে তোমার উপর চোরের নজর পড়ল কেন বলো তো! রাত-বিরেতে যদি দলবল জুটিয়ে আসে তখন তো আরও বিপদ। আমি বুড়ো মানুষ, আর তুমি জোয়ান হলেও পালোয়ান তো নও। ঠেকাবে কী করে?'

শিবেন দুশ্চিন্তায় পড়ে বলল, 'হুঁ।'

শ্যামাচরণ দুঃখের গলায় বলল, 'ময়নাগড় বড় শান্তির জায়গা ছিল হে। কিন্তু দিনগুলো পালটে যাচ্ছে।'

'লোক দুটো দেখতে কেমন বলতে পার?'

'অন্ধকারে কী করে বুঝব? দুটো কালো-কালো মানুষের আকার দেখেছি। তার বেশি কিছু বলতে পারব না।'

আচ্ছা শ্যামাদা, রাজবাড়িতে গুপ্তকুঠুরি কিছু আছে?' শ্যামাচরণ সন্দিহান হয়ে বলল, 'কেন বলো তো!'

'ভাবছিলাম, কিছু কাগজপত্র যদি লুকিয়ে রাখা যায়!'

শ্যামাচরণ অবাক হয়ে বলে, 'শোনো কথা? বলি কাগজপত্র কি লুকোনোর জিনিস? চোর কি কাগজপত্র চুরি করতে আসবে? বলি, সোনাদানা কিছু আছে?'

শিবেন মিনমিন করে বলে, 'না, সোনাদানা কোথা থেকে আসবে?'

'ভালো করে ভেবে দ্যাখ দিকিনি। চোরে কি আর এমনি হানা দেয়? কিছু একটা গন্ধ পেয়েই এসেছিল। সত্তর বছর আগে এ-বাড়িতে একবার ডাকাত পড়েছিল, মনে আছে।

তখন আমি ছোট। জমিদারের পাইকরা খুব লড়েছিল ডাকাতের সঙ্গে। তবে যে-সে ডাকাত তো নয়, কেলোডাকাত বলে কথা! পাইকরা তাদের লাঠি সড়কির সামনে দাঁড়াতে পারল না। সব লুটেপুটে নিয়ে গেল। তার পর থেকে আজ অবধি আর এ-বাড়িতে চোর-ডাকাত আসেনি। আর আসবেই বা কেন! বাবুদের অবস্থা পড়ে গেল। তারপর তো সব যে যার পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলল। থাকার মধ্যে এই আমি পড়ে আছি। যে বাড়ির এত জাঁকজমক ছিল, তাতে এখন ইঁদুর, বাদুর, চামচিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পড়ে আছে শুধু কয়েকখানা ভাঙা খাট-পালঙ্ক। তা এত বছর বাদে ফের চোরের আনাগোনা কেন শুরু হল সেটা ভাববার কথা।'

শিবেন বিনয়ের সঙ্গেই বলল, 'চোরের নেওয়ার মতো তো কিছু নেই শ্যামাদা। তবে টাকাপয়সা বা সোনাদানা না থাকলেও আমার কিছু রিসার্চ-ওয়ার্ক আছে। সেগুলো বেহাত হলে আমার ক্ষতি।'

'দূর! দূর! তুমিও যেমন! কাগজপত্র নিতে আসবে কোন আহাম্মক? তুমি নিশ্চিন্তে থাকো।'

শ্যামাচরণ কথাটা উড়িয়ে দিলেও শিবেনের দুশ্চিন্তা গেল না। আসল কথা হল, কলেজে পড়ার সময় থেকেই ভজহরি নামে একটা ছেলের সঙ্গে তার রেষারেষি। ভজহরি যেমন শিবেনকে দেখতে পারে না, শিবেনও তেমনি ভজহরিকে। ভজহরি আড়ালে সবাইকে বলে বেড়ায়, 'শিবেন! ও তো টুকে পাশ করেছে।' অথচ শিবেন ভালোই জানে, টুকে পাশ করেছে ভজহরিই, এবং টুকেছে শিবেনেরই খাতা থেকে। যাই হোক, রেষারেষি করেই তারা এম এসসি অবধি পাশ করেছে। দুজনেই ডক্টরেটের জন্য রিসার্চ করছে। কে কার আগে থিসিস জমা দেবে তাই নিয়ে চলছে মর্যাদার লড়াই এবং স্নায়ুযুদ্ধ। বাইরের লোক বুঝতেও পারবে না, এটা কী সাঙ্ঘাতিক প্রেস্টিজের ব্যাপার। শিবেনের ঘোর সন্দেহ, ভজহরি যেনতেন প্রকারে তার রিসার্চ ভণ্ডুল করার চেষ্টা করবে। শিবেন যে ভজহরিকে ভয় পায় তার কারণ হল, ভজহরি অনেক তুকতাক জানে। কলেজে পড়ার সময়ই সে বেশ নামকরা একজন ম্যাজিশিয়ান ছিল। তা ছাড়া কুংফু, ক্যারাটে এসবও শিখেছিল। কাজেই ময়নাগড়ে যে রহস্যময় আগন্তুকের কথা শোনা যাচ্ছে, তা যে ভজহরিই, তাতে সন্দেহ নেই। ভজহরি ছাড়া আর কে শিবেনের ঘরে হানা দেবে?

দুশ্চিন্তায় শিবেনের গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। তার রিসার্চের কাজ প্রায় শেষ। জমা দিলেই ডক্টরেট। কিন্তু তীরে এসে তরী না ডোবে! ভজহরির ভয়েই সে ময়নাগড়ের মতো অজ্ঞাত পাড়াগাঁয়ে পালিয়ে এসেছিল। কিন্তু দুর্দম, ডাকাবুকো ভজহরিকে ঠেকাতে পারল কি?

রাতে বারোখানা রুটি খায় শিবেন। আজ উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় ছ'খানার বেশি পারল না। রোজ বালিশে মাথা রাখতে না-রাখতেই গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়। আজ ঘুম তার ধারেকাছেই ঘেঁষল না। শেয়ালের ডাক, প্যাঁচার রহস্যময় কণ্ঠস্বর, গাছের ডালে বাতাসের খটখট শব্দ, কুকুরের চিৎকার, যা শুনছে তাইতেই বারবার চমকে-চমকে উঠছে সে। কেবলই ধুকধুক করছে বুক, ওই বুঝি ভজহরি এল! আর এলেও কি তাকে চিনতে পারবে শিবেন? ভজহরি বরাবর স্কুল আর কলেজের স্পোর্টসে গো অ্যাজ ইউ লাইক-এ ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে এসেছে। ছদ্মবেশ পরতে অমন সিদ্ধহস্ত মানুষ আর আছে কিনা সন্দেহ। স্কুলে তাদের হেডমাস্টার ছিলেন উপেনবাবু, সাঙ্ঘাতিক রাশভারী আর রাগী লোক। তা সেবার হল কী, স্পোর্টসের শেষে যখন গো অ্যাজ ইউ লাইক হচ্ছে তখন ভারী একটা শোরগোল উঠল। দেখা গেল, আরও একজন উপেনবাবু আসরে ঢুকে পড়ে বেত হাতে ছাত্রদের সামলাচ্ছেন। সবাই হতভম্ভ, ভ্যাবাচ্যাকা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সেক্রেটারি ভারী অবাক হয়ে বললেন, 'উপেনবাবু, আপনার কি জমজ ভাই আছে?'

উপেনবাবু হাঁ হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'না তো!'

সেক্রেটারি অবিশ্বাসের গলায় বললেন, 'তা কী করে হয়? একইরকম হাইট, এক মুখ, এক চোখ, এক মাঝখানে সিঁথি, এমনকী দুলকি চালের হাঁটা অবধি। ভাল করে ভেবে দেখুন, আপনার কোনও যমজ ভাই জন্মের পর মিসিং হয়েছিল কিনা। এরকম তো কতই হয়।'

উপেনবাবু এতটাই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন যে, কথাই বলতে পারছিলেন না। যাই হোক, শেষ অবধি পণ্ডিতমশাই দ্বিতীয় উপেনের বাঁ-হাতের কবজির কাটা দাগটা দেখে চিনতে পেরে বলে উঠলেন, 'এ যে বদমাশ ভজহরি!'

তখন হেডস্যার ভজহরির আস্পদ্দা দেখে তেড়ে গিয়ে এই মারেন কি সেই মারেন। তবে শেষ অবধি আশ্চর্য ছদ্মবেশের জন্য ভজহরি বিপুল প্রশংসা আর প্রাইজ পেয়েছিল। পরের বছর ভজহরি আরও সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করল। গো অ্যাজ ইউ লাইক যখন চলছে, তখন মাঠের মধ্যে একটি গোরু ঢুকে শান্তভাবে ঘাস খেয়ে যাচ্ছিল, কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। যখন হেডস্যার রেজাল্ট ঘোষণা করতে উঠেছেন, তখন গরুটা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে পরিষ্কার মানুষের গলায় বলল, 'দাঁড়ান স্যার, দাঁড়ান। আরও একজন কম্পিটিটার আছে যে!' সবাই হতভম্ভ। মানুষ যে এখন নিখুঁত গরু সাজতে পারে, এ যে সুদূর কল্পনাতেও আসে না। ফের প্রাইজ আর ভূয়সী প্রশংসা।

শিবেনের তাই ঘুম আসছে না। কারণ ভজহরি যে কোন রূপে দেখা দেবে তা কে জানে! এই শেয়ালটা হয়তো শেয়াল নয়, ভজহরি। ওই প্যাঁচাও হয়তো প্যাঁচা নয়,

ভজহরি। যে বালিশে সে মাথা রেখে শুয়ে আছে, সেটাই যে ভজহরি নয় তার ঠিক কী?

নাঃ, আর শুয়ে থাকতে পারল না শিবেন। উঠে পড়ল। বালিশের পাশেই ফাইলবন্দি তার থিসিস। এটা খুব গুপ্ত জায়গায় লুকিয়ে না রাখলে ভজহরি এসে গাপ করবে বলেই তার স্থির বিশ্বাস।

গায়ে একটা আলোয়ান জড়িয়ে থিসিস বগলে নিয়ে সন্তর্পণে ঘর থেকে বেরোল শিবেন। রাজবাড়ি তার চেনা এলাকা। সঙ্গে টর্চ থাকলেও সে তা জ্বালাল না। খুব নিঃশব্দে সে গাছপালার ভিতর দিয়ে আত্মগোপন করে রাজবাড়ির দিকে এগোতে লাগল।

আকাশে ক্ষয়াটে একটু চাঁদ আছে বটে, কিন্তু কুয়াশার জন্য আলোটা বড়ই ঘোলাটে। তবে শিবেনের অসুবিধে নেই, রাজবাড়ির চৌহদ্দি তার চেনা জায়গা। সে গাছপালার ভিতর দিয়ে সাবধানে এগোচ্ছিল। বুকটা বড় ধুকপুক করছে। রাজবাড়ির ভিতরে মেলা পুরোনো আসবাবপত্র, আলমারি, দেরাজ, কুলুঙ্গি রয়েছে। গুপ্তকুঠুরি যদি না-ও পাওয়া যায়, তা হলে অন্তত লুকিয়ে রাখার মতো একটা জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবেই।

বেশ এগোচ্ছিল শিবেন, কোথাও সন্দেহজনক কিছু দেখাও যাচ্ছে না। কিন্তু হঠাৎ কে যেন তার আলোয়ান ধরে একটা হ্যাঁচকা টান মারল। শিবেন সঙ্গে-সঙ্গে ফাইলখানা চেপে ধরে ককিয়ে উঠল, 'না ভাই ভজহরি, এরকম করাটা তোমার ঠিক হচ্ছে না। এ আমার অনেক পরিশ্রমের ফসল...!' বলে একটু বেকুব বনে গেল শিবেন। ভজহরি নয়, একটা গাছের ডালে তার চাদরটা আটকে গেছে। তবে গাছকেই বা বিশ্বাস কী? ওটাই যে ভজহরি নয় তাই বা কে জোর দিয়ে বলতে পারে?

চাদরটা ছাড়িয়ে নিয়ে শিবেন ফের এগোল। গাছপালার সারি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে রাজবাড়ি অবধি খানিকটা ফাঁকা জায়গা। শিবেন এদিকওদিক দেখে নিয়ে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে জায়গাটা পেরোতে যাচ্ছিল, ঠিক ওই সময় বাঁ-দিক থেকে কে যেন প্রায় নিঃশব্দে বিদ্যুতের গতিতে ছুটে এসে তার উপর লাফিয়ে পড়ল। শিবেন আত্মরক্ষার কোনও সুযোগই পেল না। 'বাপ রে!' বলে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। কী হয়েছে তা বিভ্রান্ত মাথায় বুঝতেই পারল না সে। কয়েক সেকেন্ড বাদে সম্বিৎ পেয়ে সে দেখল তার বুকের উপর দুটো ভারী থাবা রেখে বিরাট একটা কেঁদো বাঘ তার মুখের উপর শ্বাস ফেলছে, আর জ্বলজ্বলে চোখে দেখছে তাকে।

শিবেন অত্যন্ত ব্যথিত গলায় বলল, 'ভজহরি, এ তোমার কেমন ব্যবহার ভাই? এভাবে লোককে হেনস্থা করা কি তোমার ঠিক হচ্ছে? যতই শত্রুতা থাক, আমরা তো ছেলেবেলায় বন্ধুই ছিলাম, সেকথা কী ভুলে গেলে? সজ্ঞানে তোমার কোনও ক্ষতি করেছি, বলো! হ্যাঁ,

তোমার রবার লাগানো হলুদ পেনসিলটা চুরি করেছিলাম বটে, তবে সেটা করেছি তুমি আমার কাছ থেকে জোর করে 'যখেন ধন' বইটা কেড়ে নিয়েছিলে বলে। ক্লাস সিক্সে তোমাকে একটা চিমটি দিয়েছিলাম, কারণ, ক্লাস ফাইভে তুমি আমাকে খেলার মাঠে ঘুসি মেরেছিলে। যাই হোক ভাই, পুরোনো শত্রুতা ভুলে যাও। বাঘের ছদ্মবেশে এসেছ বলে যে তোমাকে চিনতে পারব না, আমাকে তেমন বোকা পাওনি। থিসিসটা কেড়ে নিও না ভাই, আমার রক্ত-জল করা কাজ...।'

বাঘটা বেশ মন দিয়েই তার কথা শুনছে বলে শিবেনের মনে হল। তার কাকুতি মিনতিতে কাজও শুরু হল। বাঘ ওরফে ভজহরি লম্বা লকলকে জিভটা দিয়ে ঠোঁট দুটো একবার ভালো করে চেটে নিয়ে চারদিকে একবার অলস চোখে তাকাল। তারপর প্রকাণ্ড একটা হাই তুলে ধীরেসুস্থে শিবেনের বুক থেকে পা দুটো নামিয়ে দুলকি চালে ডান ধারে চলে গেল।

শিবেনেরও হঠাৎ যেন সন্দেহ হচ্ছিল, বাঘটা নির্যস বাঘই, ভজহরি নয়। ভজহরি হলে বিপদ ছিল। শিবেন একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে উঠে পড়ল।

রাজবাড়িটাকে শ্যামাচরণ বুকে আগলে রাখে। কুটোগাছিও নড়চড় হওয়ার উপায় নেই। প্রতি সপ্তাহে সে ঘরদোর পরিষ্কার করে, জিনিসপত্র যা আছে, সব যত্ন করে সাজিয়ে রাখে। সব জানলা-দরজার পাল্লা সেঁটে বন্ধ করে দিয়ে সদর দরজায় সেকেলে মজবুত বিরাট তালা ঝুলিয়ে দেয়। আপাতদৃষ্টিতে রাজবাড়িকে দুর্ভেদ্য মনে হলেও, শিবেন জানে, পিছন দিকে কর্তাদের তামাক সাজবার জন্য হুঁকোবরদারের একখানা ঘর অছে। সেই ঘরে জানলার একটা পাল্লার কবজা ভাঙা। সেটা ঠেকনা দিয়ে লাগানো থাকে। যে খবর রাখে তার পক্ষে সেই জানলার পাল্লা সরিয়ে ভিতরে ঢোকা শক্ত ব্যাপার নয়।

কাজটা শিবেনের পক্ষেও শক্ত হল না। জানলার পাল্লা সরিয়ে সে চৌকাঠে ঘোড়ায় চাপার মতো করে উঠে পড়ল। তারপর পাল্লাটা ফের জায়গামতো বসিয়ে অন্ধকার ঘরটা পেরিয়ে অপেক্ষাকৃত একটা বড় ঘুরে ঢুকে পড়ল। এটা ছিল কর্তাদের খাসচাকরের ঘর। অন্ধকারে শিবেনকে আন্দাজ করে এগোতে হচ্ছে। বাইরে যা-ও একটু আলো ছিল, ঘরে একেবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। তার পকেটে একটা খুদে টর্চ আছে বটে, কিন্তু তার ব্যাটারি ফুরিয়ে এসেছে। নিতান্ত বিশেষ প্রয়োজনেই সেটা জ্বালাতে হবে।

সামনে দরবারঘরের আগে রানি-দরবার। এ ঘর থেকে রানিমা এবং রাজবাড়ির অন্যান্য বউ-ঝি'রা দরবারের কাজকর্ম দেখত চিকের ফাঁক দিয়ে। এখনও কিছু ছেঁড়া চিক ঝুলে আছে।

শিবেন দরবার ঘরে পা দিতেই সামনের অন্ধকার থেকে কে যেন বেশ আহ্লাদের গলায় বলে উঠল, 'শিবেন যে!'

শিবেনের হৃৎপিণ্ডটা একখানা বড় লাফ মেরেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। শিবেন শক্ত হয়ে, ঠান্ডা হয়ে, কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল!

গলাটা ফের আহ্লাদের সঙ্গে বলে উঠল, 'আহা, ভয় পেয়ে গেলে নাকি হে শিবেন?'

শিবেন কাঁদো-কাদো হয়ে বলে উঠল, 'এটা কি ভালো হচ্ছে ভজহরি?'

গলাটা একটু যেন বিস্মিত হয়ে বলল, 'ভজহরি! আচ্ছা বেশ, তাই সই! না হয় ভজহরিই হলাম। কিন্তু তাতে ভয়ের কী আছে হে শিবেন? ভজহরি কি তোমাকে কামড়ে দেবে?'

'না ভজহরি, তুমি আঁচড়ে দাও, কামড়ে দাও, তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু তুমি তো আর সেইজন্য আসোনি। তুমি এসেছ আমার চার বছরের হাড়ভাঙা খাটুনিটা নষ্ট করে দিতে। তোমার অনেক গুণ ভজহরি, তা বলে আমার সঙ্গে এই শত্রুটা করাটা কি তোমার ঠিক হচ্ছে?'

'তাই তো হে শিবেন, এ কথাটা তো ভেবে দেখতে হবে।'

'তাই তো বলছি ভজহরি, একটু তলিয়ে ভেবে দ্যাখো! তোমার ভয়ে আমি এই ধাধধাড়া ময়নাগড়ে চাকরি নিয়ে পালিয়ে এসেছি, তবু তুমি আমার পিছু ছাড়োনি! পায়ে পড়ি ভাই, আমার আর যা ক্ষতি করো কিছু মনে করব না। কিন্তু আমার এই সাধনা, এই অধ্যবসায়কে নষ্ট করে দিও না।'

'আহা তোমার কথা শুনে যে আমারই কান্না পাচ্ছে হে শিবেন! কিন্তু আমি তো তোমার উপকার করতেই এসেছি। তা তোমার বগলে ওটা কী বস্তু বলো তো!'

শিবেন তার থিসিসের ফাইলটা আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরে বলল, 'না, না ভজহরি, এটার দিকে নজর দিও না। আমি কিন্তু কিছুতেই এটা তোমাকে কেড়ে নিতে দেব না! দরকার হলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব, চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব, চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে দেব, গুলি চালাব, বিপ্লব করব...'

গলাটা খুবই সমবেদনার সঙ্গে বলল, 'আহা, প্রথমেই অতটা করার দরকার কী শিবেন? সব কি একসঙ্গে পেরে উঠবে হে? বলি, রক্তগঙ্গা যে বওয়াবে, তা অত রক্ত পাবে কোথায়? আমি নিতান্ত রোগাভোগা মানুষ! আমার শরীরে তিন-চার ছটাকের বেশি রক্তই নেই। চেঁচিয়ে যে লোক জড়ো করবে, তা লোকই বা আসবে কোত্থেকে? ধারেকাছে তো

একমাত্র বুড়ো, শুঁটকো শ্যামাচরণ ছাড়া জনমনিষ্যিই নেই। আর আগুন যে জ্বালাবে, তোমার পকেটে তো দেশলাইও নেই হে! গুলি চালানোর কথা ভাবছ, বেশ ভালো কথা! কিন্তু বন্দুক, পিস্তল কি আর ভালো জিনিস হে! বেমক্কা ফেটেফুটে গিয়ে বিপত্তি বাধিয়ে বসবে। জোগাড় করাও ভারী শক্ত। এই যে দ্যাখো না, আমার পকেটে একখানা আছে! নেহাত মেহনত করে জোগাড় করতে হয়েছে ভায়া, এক কাঁড়ি টাকা দণ্ড দিয়ে।'

কাঁপা গলায় শিবেন বলে, 'তোমার পিস্তল আছে ভজহরি! ছিঃ, ভাই ছিঃ, বন্ধু হয়ে তুমি বন্ধুর কাছে পিস্তল নিয়ে এসেছ! শেষ অবধি তোমার হাতেই আমাকে প্রাণ দিতে হবে নাকি? তা না হয় দিলুম, কিন্তু তোমার যে খুব পাপ হয়ে যাবে ভজহরি!'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কণ্ঠস্বরটি বলল, 'সেটাই তো চিন্তার কথা হে শিবেন। পাপ জিনিসটাকে আমি বড় ভয় পাই। পাপটাপ করতে আমার মোটেই ইচ্ছে হয় না। তাই তো আমি লোককে বলি, যা করো তা করো ভাই, কিন্তু আমাকে দিয়ে কোনও পাপ কাজ করিও না। তবে তুমি যেন বিপ্লবের কথাও বলছিলে!'

'হ্যাঁ ভাই ভজহরি, আমি বিপ্লবের কথাও বলেছি। ঘাট হয়েছে ভাই, রাগের বশে বলে ফেলেছি, মাপ করে দাও।'

'তা নয় করছি। কিন্তু তা বলে বিপ্লব তেমন খারাপ জিনিস নয়। বিপ্লবটিপ্লব করলে বেশ গা গরম হয় শুনেছি। তবে বস্তুটা কী, তা আমি অবশ্য জানি না।'

'আমিও জানি না ভজহরি। ওসব কথা মনে করে কষ্ট পেও না। তুমি তো জানোই ভাই, তোমার মতো ক্ষমতা আমার নেই। তোমার গায়ের জোর বেশি, অনেক কায়দাকানুন জানো। ছদ্মবেশ ধরতে পার। তার উপর তোমার পকেটে পিস্তল আছে। তোমার সঙ্গে কি আমি এঁটে উঠব ভাই! দোহাই তোমার, এই অসহায় বন্ধুর কাছ থেকে তার শেষ সম্বল এই থিসিসটা কেড়ে নিও না।'

'আহা, উত্তেজিত হচ্ছ কেন শিবেন? একটু ভাবতে দাও, তোমার কথা শুনে তোমার জন্য আমার বেশ মায়া হচ্ছে। ওরেবাপু, আমি তো আর পাষণ্ড নই।'

'সেটা আমিও জানি ভজহরি। তুমি বেশ ভাল লোক। তাই বলছি, এমন কাজ কোরো না। করলে তোমাকে লোকে খারাপ বলবে। আর লোকে তোমাকে খারাপ বললে, আমি যে মনে বড় ব্যথা পাব ভাই।'

'আহা, তোমার কথা শুনলে প্রাণ জুড়িয়ে যায় হে শিবেন। তা হলে থিসিসটা তুমি হাতছাড়া করতে চাও না, এই তো?'

'হ্যাঁ ভজহরি।'

'তা হলে যে আমার একটু উপকার করতে হবে শিবেন?'

'কী উপকার ভজহরি? দরকার হলে আমি তোমার পা টিপে দিতে পারি, মাথার উকুন বেছে দিতে পারি, কুয়ো থেকে তোমার স্নানের জল তুলে দিতে পারি, তোমার এঁটো বাসন মাজতে পারি, পঞ্চাশ টাকা ধার দিতে পারি।'

'অতটা না করলেও চলবে শিবেন। আপাতত তুমি একটা সহজ কাজই বরং করো।'

'কী করতে হবে ভজহরি?'

'এই রাজবাড়িতে পানিঘর বলে একটা ঘর আছে, জানো?'

'না তো!'

'আছে। মাটির নীচে একটা অন্ধকার ঠান্ডামতো ঘর, যেখানে মস্ত বড়-বড় জালায় গরমকালে রাজবাড়ির লোকেদের জন্য খাবার জল রাখা হত। আমি অনেক খুঁজেও ঘরটার সন্ধান পাচ্ছি না। তোমাকে সেই ঘরটা খুঁজে বের করে দিতে হবে।'

'কেন ভজহরি, তোমার কি খুব তেষ্টা পেয়েছে ভাই? যদি পেয়ে থাকে তো বলো, আমি তোমাকে জল এনে দিচ্ছি। টাটকা জল ছেড়ে পানিঘরের পুরোনো পচা জল খাওয়ার দরকার কী তোমার? শেষে পেটটেট খারাপ করবে! এই শীতে কি বেশি ঠান্ডা খাওয়া ভালো?'

'কথাটা মন্দ বলোনি শিবেন! খুব যুক্তিযুক্ত কথাই। তবে আমার তেষ্টাটাও খুব বেয়াদব তেষ্টা। সাধারণ জলে ও তেষ্টা মেটার নয়। পানিঘরের পুরোনো জলের সন্ধানেই আসা কিনা! ঘরটার সন্ধান যে আমার চাই।'

শিবেন মিইয়ে গিয়ে বলল, 'রাজবাড়ির ভিতরকার সুলুকসন্ধান যে আমি জানি না ভজহরি, জানে শ্যামাদা। কিন্তু সে বড্ড তেরিয়া লোক। রাজবাড়ির ভিতরকার খবর তার কাছ থেকে বের করা খুব শক্ত। বাড়িখানা সে যমের মতো আগলে রাখে। আমাকে অবধি ঢুকতে দেয় না।'

'তা হলে তো বড় মুশকিল হল শিবেন। পানিঘরের সন্ধান না পেলে যে অনিচ্ছের সঙ্গেই তোমার থিসিসটা আমাকে কেড়ে নিতে হবে।'

আঁতকে উঠে শিবেন বলে, 'না, ভাই না। কী করতে হবে বলো, করছি।'

'শোনো শিবেন, গরুর বাঁটে যে দুধ থাকে তা কি সে এমনিতে দেয়? গরুর বাঁটের নীচে বালতি পেতে রাখো, সাধ্যসাধনা করো, দুধ দেওয়ার পাত্রীই সে নয়। কিন্তু বাঁট ধরে চাপ দাও, দেখবে দুধের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। এই যে সবাই জানে, ধানের ভিতরে চাল থাকে, কিন্তু ধান কি চালকে ছাড়তে চায় সহজে? ঢেঁকিতে ফেলে ধানের উপর চাপ সৃষ্টি করো, দেখবে, কেমন হাসতে-হাসতে চাল বেরিয়ে পড়েছে। এই ধরো না কেন, টিউবের মধ্যে যে টুথপেস্ট থাকে, এমনিতে বেরোয় কি? টিউবের ঘাড় ধরে চেপে দাও, দেখবে, সড়াক করে পেস্ট বেরিয়ে পড়বে।'

শিবেন একমত হয়ে বলল, 'সে তো ঠিক কথাই হে ভজহরি। চারদিকে তো চাপেরই জয়জয়কার দেখছি। গরম ইস্তিরি দিয়ে চেপে ধরলে কোঁচকানো কাপড় যেমন সটান হয়ে যায়, ফোঁড়া টনটন করছে তো চেপে ধরো, পুচ করে পুঁজ বেরিয়ে ব্যথার আরাম হয়ে যাবে। এই তো সেদিন একটা কাঁকড়াবিছে চটি দিয়ে চেপে ধরলুম, ব্যাটা চ্যাপটা হয়ে গেল। না হে ভজহরি, যে যত চেপে ধরতে পারে তারই তত সুবিধে।'

'হ্যাঁ শিবেন, চাপ দিতে জানলে সব কাজ হয়। তাই বলছিলাম, তুমিও যদি শ্যামাচরণের উপর একটু চাপ সৃষ্টি করতে পার, তা হলে পানিঘরের কথা সে লক্ষ্মীছেলের মতো বলে দেবে।'

'কিন্তু কীরকমভাবে চাপ সৃষ্টি করতে হবে ভজহরি? তার বুকের উপর হাঁটু গেড়ে বসতে হবে কি?'

'হুঁ, সে প্রস্তাবও মন্দ নয় বটে। তবে কী জানো? শ্যামাচরণ বুড়ো মানুষ। তার উপর রোগাভোগা। তোমার মতো একটা দশাসই লোক বুকে চেপে বসলে হিতে বিপরীত হতে পারে তো! শ্যামাচরণ পটল তুললে পানিঘরের হদিশ দেবে কে?'

'তাই তো ভজহরি, আমার ওজন যে দু-মন দশ সের, সেই কথাটা মনে ছিল না। তা হলে কি গাঁ থেকে একটু হালকা দেখে কাউকে ডেকে আনব ভজহরি?'

'তুমি খুবই বুদ্ধিমান হে শিবেন। তবে কিনা অন্য কেউ শ্যামাচরণের উপর চাপ সৃষ্টি করতে না-ও চাইতে পারে। যাই হোক, এ-ব্যাপারে অন্য কাউকে চাপাচাপি করার দরকার নেই। তুমি বরং একটা কাজ করো, আমার পিস্তলটা নিয়ে যাও। চাপ সৃষ্টি করার পক্ষে এটা খুবই ভালো জিনিস।'

'কিন্তু ভাই, পিস্তল দিয়ে আমি যে কোনওদিন চাপ সৃষ্টি করিনি। কী করে করতে হয় তাও জানি না।'

'তোমাকে কিছুই করতে হবে না শিবেন। পিস্তল নিজেই চাপ সৃষ্টি করবে। তুমি শুধু জুতমতো বাগিয়ে ধরে কঠিন গলায় বলবে, 'পানিঘরের সন্ধান যদি না দাও, তা হলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।'

'বাঃ, এ তো সোজা কাজ! কিন্তু পিস্তলটা আবার ফুটেটুটে যাবে না তো! একটু আগে তুমিই যেন বলছিলে, বন্দুক, পিস্তল অনেক সময় ফুটে যায়।'

'সব কাজেরই বিপদের দিক থাকে হে শিবেন। ভয় পেও না! পিস্তলের উপর চাপ সৃষ্টি না করলে সে কিছু করবে না।'

'কথাটা যেন কী বলতে হবে?'

''পানিঘরের সন্ধান যদি না দাও তা হলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।' অবশ্য প্রথমেই কথাটা বলার দরকার নেই। আগে একটু আদুরে গলায় আদর করার মতো পানিঘরের সন্ধান চাইবে। তারপর একটু অভিমান করে ঠোঁট ফোলাবে। তাতেও কাজ না হলে গৃহত্যাগ করার হুমকি দেবে। তারপর চোখ রাঙাবে। তারপর ভয় দেখাবে। শেষ অবধি কাজ না হলে পিস্তল বাগিয়ে ওই কথাটা বলবে। পারবে না শিবেন? না পারলে তোমার থিসিস...'

'খুব পারব, খুব পারব,' বলে শিবেন রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে হাত বাড়িয়ে বলল, 'দাও ভাই ভজহরি, তোমার পিস্তলটা আমাকে দাও। এক্ষুনি গিয়ে শ্যামাচরণের উপর চাপ সৃষ্টি করে পানিঘরের হদিশ জেনে আসছি। শুধু কথা দাও, পানিঘরের হদিশ দিলে তুমি আমার থিসিসটার দিকে হাত বাড়াবে না।'

'পাগল নাকি! শত হলেও আমি তোমার ছেলেবেলার বন্ধু। কথার খেলাপ হবে না ভাই। পানিঘরের খবর দিতে পারলে তোমার কোনও ভয় নেই।'

ছায়ামূর্তি অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে শিবেনের হাতে যে জিনিসটা দিল, সেটা ছোট হলেও বেশ ভারী। পিস্তল সম্পর্কে শিবেনের কোনও অভিজ্ঞতা নেই। সে শঙ্কিত গলায় বলল, 'ভাই ভজহরি, এ তো তে-কোনা একটা বিচ্ছিরি চেহারার জিনিস। এটার কোন মুখ দিয়ে গুলি বেরোয় তা তো জানি না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছায়ামূর্তি বলল, 'হাতলটা ধরে নলটা তাক করতে হয়। উলটোপালটা করে ফেললে কিন্তু তোমার পিস্তলের গুলি তোমাকেও ছেড়ে কথা বলবে না।'

'ওরে বাবা, এ তো খুব বিপদের জিনিস ভাই ভজহরি!'

ছায়ামূর্তি একটু দূরে সরে গিয়ে আড়াল থেকে বলল, 'খুব বিপজ্জনক। প্রাণ হাতে করেই কাজ হাসিল করতে হবে। থিসিসটার জন্য এটুকু বিপদ কি খুব বেশি হল হে শিবেন?'

'কিছু না, কিছু না। থিসিসের জন্য আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।'

'বাঃ, এই তো বীরের মতো কথা!'

শিবেন এক হাতে পিস্তল, অন্য হাতে থিসিসের ফাইলটা শক্ত করে ধরে অন্ধকারে সাবধানে ঘর পেরিয়ে জানলা গলে বেরিয়ে এল। ভজহরির খপ্পর থেকে থিসিসটাকে বাঁচাতে হলে তাকে কিছু বিপদের ঝুঁকি নিতেই হবে, অন্য উপায় নেই।

বাগান পার হয়ে খাজাঞ্চিখানায় পৌঁছে সে সোজা শ্যামাচরণের দরজায় ধাক্কা দিতে গিয়ে দেখল, শ্যামাচরণের দরজা হাট করে খোলা। ভিতরে কেউ নেই। নিবু-নিবু টর্চের আলোয় সে ঘরখানা ভালো করে দেখে নিয়ে বাইরে এসে চারদিকটা খুঁজল। লোকটা গেল কোথায়?

পাঁচ

নিজের বাড়িতে পাঁচু যে ঘরটায় শোয় সেটাকে ঘর বললে বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। ঘর হতে গেলে যা-যা লাগে তার অনেক কিছুই নেই। যেমন ঘরের জন্য চাই চারটে দেওয়াল বা বেড়া। তা পাঁচুর ঘরখানার বেড়া মোটে তিনটে। অন্য দিকটা হাঁ করে খোলা। বারান্দার এক কোণে দুদিক কোনওরকমে বেড়া দিয়ে ঘিরে পাঁচুর বৈঠকখানা তৈরি হয়েছে। দরজা মোটে নেই, তার দরকারও হচ্ছে না। একটা দিক উদোম খোলা। তা তাতে পাঁচুর কোনও অসুবিধেও নেই। রাতবিরেতে রাস্তার কুকুর-বেড়ালরা এসে তার নড়বড়ে তক্তপোশের তলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে। বর্ষাবাদলায় আর এই শীতকালটায় যা একটু অসুবিধে। তা সেসব পাঁচু গায়ে মাখে না। ওসব তার সয়ে গেছে। উদোম ঘরে থাকে বলে মাঝে-মাঝে নানা ঘটনাও দেখতে পায়। এই যে গাঁয়ের নিশি চৌকিদার ঘুমোতে-ঘুমোতে গাঁ চৌকি দিয়ে বেড়ায়, এই কি কেউ জানে? পাঁচু জানে।

তা একদিন সে নিশি চৌকিদারকে দিনের বেলায় বাজারে পাকড়াও করে বলল, 'ও নিশিদাদা, রাতে যখন তুমি গাঁয়ে পাহারা দাও, তখন তোমার নাক ডাকে কেন গো?'

নিশি চোখ বড়-বড় করে বলল, 'ওরে চুপ-চুপ! কাউকে বলে ফেলিসনি যেন! অনেক সাধ্যসাধনা করে শেখা রে ভাই, লোকে টের পেলে পঞ্চায়েতে নালিশ হবে, আমার চাকরি যাবে।'

'কিন্তু কেউ কি ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে হাঁটতে পারে?'

'আহা, কাজটা এমন শক্তই বা কী! পা দু-খানাকে জাগিয়ে রেখে আমার বাকিটা ঘুমোয়। অব্যেস করলে তুইও পারবি।'

এই যেমন বিষ্ণু চোর। তার স্বভাব হল কারও বাড়ি থেকে সোনাদানা, টাকাপয়সা বা গয়নাগাটি সরাবে না। তার লোভ হল খাবার জিনিস। একদিন গ্রীষ্মকালে বিষ্ণুর পিছু নিয়েছিল পাঁচু। রাত বারোটা নাগাদ বিষ্ণু উদ্ধববাবুর বাগানে বসে আস্ত একখানা পাকা কাঁঠাল, কুড়িখানা পাকা আম খেল। তারপর পশুপতিবাবুর বাড়ির রান্নাঘরে ঢুকে আধ হাঁড়ি পান্তা আর তেঁতুল দিয়ে রান্না চুনো মাছের ঝোল খেল। নরহরিবাবুর বাড়িতে কিছু না পেয়ে খেল আধ ডজন কাঁচা ডিম। ব্যায়ামবীর গদাধরের বাড়িতে সারারাত ধরে নীচু আঁচে এক সের মাংসের আখনি রান্না হয়, সকালে গদাধর ব্যায়ামের পর সেটা খায়, তা বিষ্ণু সেই এক হাঁড়ি আখনি চেটেপুটে খেয়ে যখন শ্রীপদদের বাড়িতে ঢুকে তাদের মিষ্টির দোকানের জন্য রাতে তৈরি করা রসগোল্লার গামলা সাবড়ে ফেলল, তখন পাঁচু আর থাকতে না পেরে সামনে গিয়ে সটান বলল, 'বিষ্ণুদাদা, বলি এত খাবারদাবার যাচ্ছে কোথায় বলো তো! ভগবান তো তোমাকে একটার বেশি পেট দেয়নি।'

বিষ্ণু খুব অভিমান করে বলল, 'আমার খাওয়াটাই বেশি দেখলি রে পাঁচু! বেহান থেকে শুরু করে সুয্যি পাটে নামা অবধি আমাকে কখনও কুটোগাছটি দাঁতে কাটতে দেখেছিস? সারাদিন উপোসি পেটে পড়ে-পড়ে ঘুমোই, এই নিশুত রাতেই যা দুটি পেটে যায়। খাওয়াটা দেখলি আর উপোসটা দেখলি না?'

তা আজ রাতেও পাঁচুর ঘুম আসছিল না। তার তক্তপোশের নীচে যে কেলো কুকুরটা থাকে, সেটা মাঝে-মাঝে কেন যেন খ্যাঁক-খ্যাঁক করে উঠছিল। থানার পেটা ঘড়িতে যখন ঢংঢং করে রাত দুটো বাজল, তখন হাই তুলে উঠে বসে রইল পাঁচু। আজ বড্ড শীত পড়েছে, ছেঁড়া কম্বলে শীত মানছে না। ঠান্ডায় হাত-পায়ে ব্যথাও হয়েছে খুব। চারদিকে ঘন কুয়াশা, অন্ধকার। তবে পাঁচু অন্ধকার আবছায়াতেও অনেক কিছু দেখতে পায়। তার চোখ খুব ভালো। কানও সজাগ। গাছের পাতা খসলেও সে টের পায়।

ঘণ্টার রেশ মিলিয়ে যাওয়ার পরই সে সামনের রাস্তায় যেন একজোড়া খুব হালকা পায়ের শব্দ শুনতে পেল। শব্দটা এতই ক্ষীণ যে, অন্য কেউ টেরই পাবে না। রাতে যারা

ঘোরাফেরা করে তাদের পায়ের শব্দ পাঁচু খুব চেনে। কিন্তু এটা চেনা শব্দ নয়। দক্ষিণ থেকে কেউ উত্তরমুখো যাচ্ছে। কিন্তু যাচ্ছে বেশ ধীরেসুস্থে, যেন বেড়াতে বেরিয়েছে।

পাঁচু বিছানা থেকে নেমে বারান্দা পেরিয়ে সামনের জমিটা ডিঙিয়ে রাস্তায় উঠে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল। দেখল, খুব বেঁটেমতো গোলাকার চেহারার একটা কিম্ভূত কিছু দুলে-দুলে আসছে। কাছে আসতেই ভারী অবাক হয়ে গেল পাঁচু। মানুষ নাকি? এ কীরকম ধারা মানুষ?

কাছাকাছি আসতেই ব. টাকে দেখতে পেল পাঁচু। চোখ কচলে ফের ভালো করে তাকিয়ে দেখল, বস্তুটা মানুষের মতো নয়, আবার মানুষ বললেও ভুল হয় না। বুক, পেট, সব যেন একটা গোলাকার বলের মতো। তার উপরে বেজায় বড় একটা মুন্ডু, দুখানা বেঁটে পা, দুখানা ছোট-ছোট হাত, এরকম বেঢপ মানুষ পাঁচু কখনও দেখেনি।

হাঁটতে-হাঁটতে মানুষটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে চারদিকটা চেয়ে দেখে নিল। আর সেই সময় মুন্ডুটা দিব্যি ডাইনে-বাঁয়ে পাক খেল। ঘাড় না থাকলেও মুন্ডু যে এমন ঘুরতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। চারদিকটা দেখে মানুষটা হঠাৎ শিসের মতো একটা সরু শব্দ করল। ভারী মিঠে সুরেলা শব্দ। অনেকটা বাঁশির মতো। সুরটা পাঁচুর চেনা সুর নয়। কিন্তু এতই সুন্দর যে, শুনলে প্রাণ-মন ভরে যায়। অল্প একটু শুনেই পাঁচুর যেন ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল।

একটু দাঁড়িয়ে মানুষটা আবার হেলেদুলে হাঁটতে শুরু করল। আর শিস দিচ্ছে না। একটু দূর থেকে পাঁচু নিঃশব্দে লোকটার পিছু নিল। লোকটা মাঝে-মাঝে দাঁড়াচ্ছে, শিস দিচ্ছে, ফের হাঁটছে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না পাঁচু। কিন্তু কে জানে কেন, লোকটাকে তার খারাপ বলেও মনে হচ্ছে না।

টকাই ওস্তাদের বৈরাগ্য এসে গেল কিনা তা বুঝতে পারছে না নবা। জটাবাবার দয়াতেই কি এসব হয়েছে? আজকাল কাজকর্মের দিকে ওস্তাদের নজরই নেই। রাত্রি দশটা বাজতে না-বাজতেই খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে। তারপর নাক ডাকিয়ে সে কী ঘুম রে বাবা! তা এরকম চললে নবার যে হাঁড়ির হাল হবে, তা কি ওস্তাদ বুঝতে পারছে না? মুশকিল হল যে, এতকাল টকাইয়ের শাগরেদগিরি করেও তেমন মানুষ হয়ে ওঠেনি। একা-একা কাজকর্ম করতে গেলেই নানা ভজঘট্ট বেধে যায়। এই তো পরশুদিন খগেনবাবুর বাড়িতে হানা দিয়ে ভারী অবাক হয়ে দেখল, দক্ষিণ দিকের ঘরখানার জানলার পাল্লা খোলা আর গ্রিলটা ভারী নড়বড় করছে। একটু টানাটানিতেই সেই গ্রিলখানাও ঝুলে পড়ল। সুবর্ণ সুযোগ আর কাকে বলে! নবা টুক করে জানলা গলে ঘরে ঢুকে পড়ল।

ভগবান যে আছেন তা মাঝে-মাঝে বড্ড বেশি টের পাওয়া যায়। কারণ, নবা অবাক হয়ে দেখল তাকে মেহনত থেকে বাঁচাবার জন্যই যেন ছিটকিনি নেমে গেল। নবা বাটামটাও খুলে ফেলল। একটুও শব্দ হয়নি। পরিষ্কার হাতে পরিপাটি কাজটি করে ফেলতে পেরে ভারীত খুশি হল সে। হ্যাঁ, টকাই ওস্তাদের শাগরেদের যোগ্য কাজই বটে! দরজা ঠেলে সামান্য ফাঁক করে সরু হয়ে ঢুকেও পড়ল সে। ঢুকেও বেশ খুশিই হল সে। ঘরে দিব্যি হ্যারিকেনের আলো জ্বলছে, অন্ধকারে হাতড়ে মরার দরকার নেই। ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে কাজে হাত দিতে গিয়ে একটু চক্ষুলজ্জায় পড়ে যেতে হল নবাকে।

কারণ, দেখতে পেল, নন্দবাবু মশারির ভিতরে বিছানায় বসে জুলজুল করে তার দিকেই চেয়ে আছেন।

নবা লজ্জা পেয়ে মাথা চুলকে নতমুখে বলল, 'এই একটু এসে পড়েছিলাম আরকি এদিকে!'

নন্দবাবু শশব্যস্তে বলে উঠলেন, 'আস্তাজ্ঞে হোক, আস্তাজ্ঞে হোক। আসবেন বইকী ভাই, এ আপনার নিজের বাড়ি বলে মনে করবেন, কী সৌভাগ্য আমার! তা ভাই আপনি কে বলুন তো, কোথা থেকে আসছেন? এই শীতের রাতে ঠান্ডায় কষ্ট হয়নি তো!'

ফাঁপরে পড়ে নবা আমতা-আমতা করে বলল, 'তা ঠান্ডাটা খুব পড়েছে বটে মশাই! তবে কিনা বিষয়কর্ম বলে কথা! ঠান্ডা গায়ে মাখলে কি আমাদের চলে?'

'বটেই তো! বটেই তো! তবে মাফলার বা বাঁদুরে টুপিতে মাথাটাথা একটু ঢেকেঢুকে তো আসতে হয় ভাই! পট করে আবার ঠান্ডা না লেগে যায়! তার উপর বাইরে ওই শীতে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কত কষ্ট করে শিক দিয়ে পরদা ফাঁক করতে হল, তার দিয়ে ছিটকিনি খুলতে হল, সুতো বেঁধে বাটাম নামাতে হল, তা এত কষ্ট করার কী দরকার ছিল ভাই? আগে থেকে একটা খবর দিয়ে রাখলে আপনার জন্য কি আর ওটুকু কাজ আমিই করে রাখতুম না!'

নবা ভারী অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'না, না, কষ্ট কীসের? আমরা হলুম গে মেহনতি মানুষ! খেটেই খেতে হয় কিনা।'

'না ভাই, ওটা কোনও কাজের কথা নয়। এই আমাদের মতো অধম লোকেরা থাকতে আপনার মতো গুণী মানুষেরা কষ্ট করবেন কেন? আপনি হলেন শিল্পী মানুষ। কী পাকা হাত আপনার! চোখ জুড়িয়ে যায়। একটুও শব্দ হল না, একটা ভুল হল না, নিখুঁতভাবে ছিটকিনি নেমে গেল, বাটাম খুলে গেল। আমি তো আগাগোড়া মুগ্ধ হয়ে দেখছিলুম। কী বলব ভাই, নিতান্ত বয়সে আপনি ছোট, নইলে আমার খুব পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করছে।'

কথাবার্তা বেশ উচ্চগ্রামেই হচ্ছিল। নিশুত রাতে কথাবার্তার শব্দ উঁচুতে উঠলে বাড়ির লোকের ঘুম ভেঙে যাওয়ার কথা। আর সেরকম লক্ষণ টেরও পাচ্ছিল নবা। এপাশ-ওপাশের ঘর থেকে সাড়াশব্দ হতে লেগেছে। কে যেন বলে উঠল, 'ও ঘরে কাদের কথাবার্তা হচ্ছে?'

একজন মহিলা কাকে যেন ঘুম থেকে ঠেলে তুলছেন, 'ও পটল, ওঠ, ওঠ, তোর বাবার ঘরে কী হচ্ছে দ্যাখ তো গিয়ে!'

নবা বেগতিক বুঝে তাড়াতাড়ি হাতজোড় করে বলল, 'তা হলে নন্দবাবু, আজ বরং আসি। আজ আপনি ব্যস্ত আছেন তো, বরং আর-একদিন আসা যাবে...!'

নন্দবাবু আর্তনাদ করে উঠলেন, 'সে কী ভাই, এখনই যাবেন কী? ভালো করে আপ্যায়ন করা হল না, অভ্যর্থনা হল না, পরিচয় অবধি হয়নি, এক কাপ চা খেলেন না, সঙ্গে দুটো মুচমুচে বিস্কুট, বাড়ির লোকজনের সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা হল না, এখনই কি ছাড়া যায় আপনাকে? দুঃখ দেবেন না ভাই, বরং জুত করে বসুন।'

নবা শশব্যস্তে বলে উঠল, 'বসার জো নেই নন্দবাবু, আমার পিসির এখন-তখন অবস্থা, আজ আর চাপাচাপি করবেন না, একটা ভালো দিন দেখে বেড়াতে-বেড়াতে চলে আসবখন...'

বলেই পট করে দরজাটা খুলে বেরিয়ে ছুট লাগাল নবা। পিছনে অবশ্য নন্দবাবু চেঁচাচ্ছিলেন, 'ও ভাই, ও চোরভাই, আবার আসবেন কিন্তু ভাই, বড় দুঃখ দিয়ে গেলেন।'

তা নবার এখন বেশ দুঃসময়ই যাচ্ছে। টকাই ওস্তাদ গতর না নাড়লে এমনই চলবে।

সকালবেলাতে গিয়েই সে টকাইয়ের বাড়িতে থানা গেড়ে বসল। বলল, 'ওস্তাদ, কাজকর্ম যে বড় ভণ্ডুল হয়ে যাচ্ছে। আপনি গতর না নাড়লে যে রাজ্যপাট সব আনাড়ি চোরছ্যাঁচড়াদের হাতে চলে যাবে। কাঁচা হাতের মোটা দাগের কাজ দেখে লোকে যে ছ্যাঃ ছ্যাঃ করতে লেগেছে।'

টকাই সকালের দিকে একটু সাধনভজন করে। একটু ব্যায়াম-প্রাণায়ামও করতে হয়। সেসব সেরে সবে একটু বসে জিরোচ্ছিল। নবার দিকে চেয়ে ভ্রু কুচকে বলল, 'কাল রাতে কারও বাড়িতে ঢুকেছিলি বুঝি?'

নবা লজ্জা পেয়ে মাথা নত করে ঘাড়টাড় চুলকে বলল, 'ওই একটু ছোটখাটো কাজ, হাত মকশো করতেই গিয়েছিলাম ধরে নিন।'

'সুবিধে হল না বুঝি?'

'আজ্ঞে, ঠিক তা নয়। কাজের বেশ প্রশংসাই হয়েছে। নন্দগোপালবাবু তো খুব বাহবাই দিলেন। ফের আর-একদিন যেতেও বলেছেন।'

টকাই বিস্মিত হয়ে বলে, 'নন্দগোপাল! হুঁ! যে চোরের আক্কেল আছে, সে কখনও নন্দগোপালের ঘরে ঢোকে?'

'কেন ওস্তাদ?'

'বিগলিত ভাব দেখে ভুলেও ভাবিসনি যে, নন্দগোপাল সোজা পাত্তর। ও হল পুলিশের আড়কাঠি। সারা গাঁয়ের সব খবর গিয়ে থানায় জানিয়ে আসে। তোর নামধাম, নাড়িনক্ষত্র সব তার খাতায় টোকা আছে। আজই যদি পুলিশ তোকে ধরে নিয়ে গিয়ে ফাটকে পোরে, তা হলে অবাক হোস না।'

'ও বাবা! তবে কী হবে ওস্তাদ?'

'চোরধর্ম বলে একটা কথা আছে জানিস? চোরদের অনেক বাছবিচার করে কাজে নামতে হয়। যার-তার বাড়িতে গিয়ে হামলে পড়লেই তো হল না! কার চৌকাঠ ডিঙোতে নেই, কার কাছ থেকে শতহস্ত দূরে থাকতে হয়, কার ছায়া মাড়াতে নেই, সে সমস্ত শেখার জিনিস, বুঝলি?'

'যে আজ্ঞে। তবে আপনি এই কম বয়সেই রিটায়ার নিয়ে নেওয়ায় আমি যে বড় বিপদে পড়েছি ওস্তাদ। এখনও কত কী হাতেকলমে শেখা বাকি রয়ে গেছে। সিলেবাস তো এখনও অর্ধেকই শেষ হয়নি। কোচিং-এ বেজায় ফাঁক পড়ে যাচ্ছে যে!'

'রিটায়ার করেছি তোকে কে বলল? এ সব পাপ কাজে একটু অনিচ্ছে এসেছে ঠিকই, তবে অন্য দিকে কাজ বেজায় বেড়ে গেছে।'

নবার চোখ চকচক করে উঠল, 'তা হলে কি চুরি ছেড়ে ডাকাতি ধরে ফেললেন ওস্তাদ? আহা, ডাকাতি বড় জব্বর জিনিস। আমার মনের মতো কাজ। চুরিতে বড্ড মগজ খেলাতে হয়, হাত মকশো করতে হয়, গেরস্তের হাতে হেনস্থা হওয়ারও ভয় থাকে। ডাকাতি একেবারে খোলামেলা জিনিস। বন্দুক-তলোয়ার নিয়ে জোকার দিয়ে পড়ো, চেঁছেপুঁছে নিয়ে এসো। গেরস্ত ভয়ে ঘরের কোণে বসে ইষ্টনাম জপ করবে আর হাতে-পায়ে ধরে প্রাণ ভিক্ষে চাইবে। সে-ই ভালো ওস্তাদ! পাকা চোর হওয়ার অনেক মেহনত, অনেক হ্যাপা। ডাকাতি একেবারে জলের মতো সোজা কাজ।'

'ওরে মুখ্যু, ডাকাতির নামে নাল গড়াচ্ছে! বলি, আর্ষ কাকে বলে জানি?'

'আজ্ঞে না ওস্তাদ!'

'আর্ষ মানে হল ঋষির দেওয়া নিদান। প্রত্যেক বংশেরই আদিতে একজন করে মুনি বা ঋষি থাকেন। আর্ষ হল সেই ঋষির দেওয়া বিবিধ ব্যবস্থা। এই যে পাঁচকড়িবাবুর বাড়িতে কাসুন্দি তৈরি নিষেধ, ওই যে উদ্ধববাবুর বাড়িতে শোল বা বোয়াল মাছ ঢোকে না, এই যে ভজহরিবাবুদের বংশে দুর্গাপুজো হয় না, সে কেন জানিস? আর্ষ নেই বলে। ওদের মুনি-ঋষিরা ওসব নিষেধ করে গেছেন।'

নবা একটু ভাবিত হয়ে বলল, 'তাই বটে ওস্তাদ। আমার বাড়িতে কেউ কখনও পুব দিকে রওনা হত না। পুব দিকে যেতে হলে আগে পশ্চিম দিকে রওনা হয়ে তারপর ঘুরপুথে পুব দিকে যেত। আমরা পুব দিকে গেলে নাকি ঘোর অমঙ্গল। তা অমি যেমন ভুলে মেরে দিয়েছি বলেই কি আমার কিছু হচ্ছে না ওস্তাদ?'

'ওই তো বললুম, ঋষিবাক্য লঙ্ঘন করা মহা পাপ। আমারও ডাকাতির আর্ষ নেই, বুঝলি? চুরি পর্যন্ত অ্যালাউ, কিন্তু ডাকাতি কখনও নয়।'

'এইবার জলের মতো বুঝেছি। আর-একটু বুঝলেই অন্ধকারটা কেটে যায়।'

'আর কী বুঝতে চাস?'

'ওই যে চুরি ছেড়ে আর-একটা কী যেন করার কথা ভাবছেন?'

টকাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'বড়ই গুহ্য কথা রে। তোকে বলা কি ঠিক হবে?'

নবা করুণ গলায় বলল, 'না বললে যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ধড়ফড় করে মরে যাব ওস্তাদ। গুহ্য কথা না শুনলে যে বড় মুহ্যমান অবস্থা হয় আমার।'

'তা হলে বলছি শোন। ওই জটাবাবা লোকটা সাধুফাদু কিছু নয়। ওই হিজিবিজি ছেলেটাও জালি। প্রথম দিন দেখেই আমার মনে হয়েছিল, ওদের অন্য কোনও মতলব অছে। জটাবাবার বেদিটা তো দেখেছিলি। তোর অবশ্য দেখার চোখ নেই। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, চট আর কম্বলে ঢাকা বেদিটা আসলে একটা বড়সড় কাঠের বাক্স। তোর যেমন দেখার চোখ নেই, তেমনই শোনারও কান নেই। থাকলে টের পেতিস, ওই ঘরখানায় ওই দুজন ছাড়া তৃতীয় আর-একজন কেউ ছিল। আমি তার শ্বাসের শব্দ পেয়েছি। তোকে বলেছিলাম সেই কথা। আমি তিন-চারদিন করে নিশুতি রাতে গিয়ে জটাবাবার আস্তানায় নজর রেখেছি। কী দেখেছি জানিস?'

নবা বড়-বড় চোখ করে শুনছিল, বলল, 'কী ওস্তাদ?'

'নিশুতি রাতে ওরা ঢাকনা সরিয়ে কাঠের বাক্সটা থেকে একটা অদ্ভুত জীবকে বের করে। মানুষ বলে মনে হয় না, কিন্তু দেখতে আবার খানিকটা মানুষের মতোই। খুব বেঁটে, পেট আর বুক মিলিয়ে অনেকটা বলের মতো গোলাকার, মাথাটাও গোল। তবে নাক, মুখ, চোখ, সবই আছে। মনে হয় আজব জীবটাকে ওরা সারাদিন কড়া ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখে, রাত্তিরবেলা জাগায়। কিন্তু ওষুধের জন্য কিম্ভূত জীবটার ঘুম ভাঙতেই চায় না। তাই তাকে ওরা গরম লোহার শিক দিয়ে ছ্যাঁকা দেয়, থাপ্পড় মারে, নানা অত্যাচার করে।'

'এ তো খুব অন্যায় কথা ওস্তাদ! দেশটা যে অরাজকতায় ভরে গেল!'

'এখন মুখ বন্ধ রেখে শোন। ওই বেঁটে মানুষটা কথাটথা কয় কিনা আমি সেটা মন দিয়ে শুনবার চেষ্টা করেছি। মাঝে-মাঝে একটুআধটু কথাও বলে বটে, তবে অস্পষ্ট সব শব্দ। অং, বং, ফুস গোছের কিছু আওয়াজ। সেসব কথা ওই জটাবাবা আর তার চেলাও বুঝতে পারে না। তবে বেঁটে লোকটা মাঝে-মাঝে শিস দেওয়ার মতো ভারী সুন্দর সুরেলা শব্দ করতে পারে। এত সুন্দর শব্দ আমি জীবনে শুনিনি। প্রাণটা যেন ভরে যায়। রাত্তিরে বেঁটে লোকটাকে ওরা খেতেও দেয়। শুধু ফল ছাড়া সে অবস্য কিছুই খায় না। ফল বলতে শুধু আপেল, আঙুর নয়, তার সঙ্গে বটফল, নাটাফল, এসবও খায়। বেঁটে লোকটাকে ওরা কোথা থেকে ধরে এনেছে আর কী করতে চায়, সেটা রোজ হানা দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না। তবে লুকোছাপার বহর দেখে অনুমান করছি, ওদের মতলব ভাল নয়। তাই ভাবছি, আজ রাতে ওদের হাত থেকে ওই বেঁটে লোকটাকে উদ্ধার করব।'

নবা মহা উৎসাহে বলে উঠল, 'তা হলে দলবল জোটাই ওস্তাদ? লাঠিসোঁটাও বের করি!'

'দূর বোকা! জটাবাবা আর তার চেলার অস্তর কিছু নেই? একদিন জটাবাবাকে দেখলাম, ঝোলা থেকে একটা ছোটখাটো বন্দুক গোছের জিনিস বের করে গুলির ফিতে পরাচ্ছে। হামলা করতে গেলে ঝাঁঝরা করে দেবে। সব ব্যাপারেই মোটা দাগের কাজে ঝোঁক কেন তোর? মাথা খাটাতে পারিস না? মনে রাখবি, সব সময়েই গা-জোয়ারির চেয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে কৌশলে কাজ উদ্ধার করাই ভালো।'

'তা হলে কী করতে হবে ওস্তাদ?'

'লক্ষ করেছি, জটাবাবা আর তার চেলা দুজনে সারাদিন পালা করে ঘুমোয়। একজন ঘুমোলে অন্যজন পাহারায় থাকে। দুজনের কেউ ঘর ফাঁকা রেখে যায় না। আর-একটা কথা হল, গেরস্তদের ফাঁকি দিয়ে বোকা বানানো যত সোজা, শয়তান লোকদের ঠকানো তত সোজা নয়। তার উপর এরা হল পাষণ্ড, খুনখারাপি করতে পেছপা হবে না। ভাবছি, আজ রাতে এমন একটা কাণ্ড করতে হবে, যাতে দুজনেই তড়িঘড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। তারপর...'

নবা ডগমগ হয়ে বলে, 'সে তো খুব সোজা। ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলেই তো হয়।'

'দূর আহাম্মক! আগুন দিলে ওই জতুগৃহ চোখের পলকে ছাই হয়ে যাবে। তিনজনের কেউ বাঁচবে না। মনে রাখিস, আমরা চোর হলেও খুনি নই কিন্তু! ওসব পাপ চিন্তা করবি তো ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেব।'

'আজ্ঞে, ভুল হয়ে গেছে ওস্তাদ! আর এ কথা মনেও আনব না। তা মতলবটা কী ভাঁজলেন?'

'ভাবছি, ইদানীং ময়নাগড়ে খুব বাঘের উৎপাত হয়েছে। আমাদের দুর্গাপদ চমৎকার বাঘের ডাক নকল করতে পারে। তাকে দিয়ে কাজ হাসিল হয় কিনা!'

'আজ্ঞে, খুব হয়। আমি চললুম দুর্গাপদকে খবর দিতে।'

'ওরে, অত উতলা হোসনি। ওরা জঙ্গলে থাকে, বাঘের ডাক কিছু কম শোনেনি। তবে শুধু বাঘের গর্জন নয়, সেইসঙ্গে মানুষের আর্তনাদ মিশিয়ে দিলে কাজ হতে পারে। ভাবটা এমন হতে হবে, যাতে মনে হয়, কোনও লোককে বাঘে ধরেছে। তাতে ওরা একটু চমকাবে। নিশুত রাতে উত্তরের জঙ্গলে মানুষের গতিবিধি তো স্বাভাবিক নয়। ওরা ধরে নেবে যে, নিশ্চয়ই ওদের উপর চড়াও হতে এসে বাঘের খপ্পরে পড়ে গেছে। সরেজমিনে দেখার জন্য ওরা অস্তর নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে, বুঝেছিস?'

'হেঃ হেঃ, একেবারে জলের মতো। চোখের সামনে দৃশ্যটা দেখতেও পাচ্ছি ওস্তাদ। ওই তো জটাবাবা বেরিয়ে এল, হাতে মেশিনগান, চোখ দুখানা ধকধক করছে, আর ওই যে পিছনে হিজিবিজি, তারও হাতে পিস্তল। জটাবাবা হাঁক মারল, 'কে রে? কার এত বুকের পাটা যে সিংহের গুহায় ঢুকেছিস...?'

টকাই হেসে বলল, 'আর তোকে যাত্রার পার্ট করতে হবে না। মাথা ঠান্ডা কর। বরং বাঘে ধরলে মানুষ যে প্রাণভয়ে চেঁচায়, সেটা একটু প্র্যাকটিস কর। আজ রাতে তোকে দিয়েই ওই পার্টটা করাব বলে ভাবছি। পারবি না?'

'খুব পারব ওস্তাদ। ওই তো বোশেখ মাসে হাবু দাসের উঠোনে মাঝরাত্তিরে চুরি করতে ঢুকে আমার পায়ের উপর দিয়ে একটা হেলে সাপ বেয়ে গিয়েছিল। কী চেঁচানটাই না চেঁচিয়েছিলাম বাপ! গাঁ-সুদ্ধু লোক আঁতকে ঘুম থেকে উঠে পড়েছিল।'

'হ্যাঁ, ওইরকম চেঁচানো চাই। যা, দুর্গাপদকে খবর দিয়ে বাড়ি গিয়ে প্র্যাকটিস কর। সন্ধের মুখে তৈরি হয়ে চলে আসিস।'

নবা এতদিন পর মনের মতো কাজ পেয়ে খুশিতে ডগমগ হয়ে মালোপাড়ায় গিয়ে দুর্গাপদকে খবর দিয়ে বাড়িতে ফিরে মা কালীকে বেজায় ভক্তিভরে পেন্নাম ঠুকল। ওস্তাদ টকাইকে যে ফের চাঙা করা গেছে, এটাই মস্ত লাভ।

সারাদিন নবা বাড়ির পাশের মাঠটায় বসে চেঁচানি প্র্যাকটিস করতে লাগল। কিন্তু ফল যা দাঁড়াল তা বেশ দুশ্চিন্তার বিষয়। তার 'বাঁচাও-বাঁচাও, মেরে ফেললে, খেয়ে ফেললে।' চিৎকার শুনে লোকজন সব লাঠিসোঁটা নিয়ে ছুটে আসতে লাগল। কিন্তু এসে কেউ কিছু বুঝতে পারল না।

উদ্ধববাবু বললেন, 'বলি ওরে নবা, তোর চেঁচানি শুনে তো মনে হচ্ছে তোকে বাঘেই ধরেছে। কিন্তু বাঘটা গেল কোথায়? বাঘ তোকে খেল, না তুই-ই বাঘটাকে খেয়ে ফেললি বাপ?'

ভজহরিবাবু বললেন, 'রিখটার স্কেলে এই চেঁচানির মাপ হল সাড়ে ছয়। এরকম চেঁচালে বাঘ-সিংহের আত্মা খাঁচাছাড়া হওয়ার কথা।'

শিবেন গম্ভীরভাবে বলল, 'শব্দের মাপ রিখটার স্কেল দিয়ে হয়না ভজহরিবাবু। ওটা হল ডেসিবেল।'

গদাধর মাসল ফুলিয়ে এগিয়ে এসে বলল, 'আরে বাঘফাঘ নয়, নবা ভূত দেখেছে। আজকাল এ গাঁয়ে বেশ ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে দেখছি।'

ভজহরিবাবু প্রতিবাদ করে বললেন, 'কক্ষনো নয়। নবা মেরে ফেললে, খেয়ে ফেললে বলে চেঁচাচ্ছে। সায়েন্সে স্পষ্ট করে বলা আছে, ভূত কখনও মানুষ খায় না। ভূতের খাদ্য হল অক্সিজেন, হাইড্রোজেন আর নাইট্রোজেন।'

গদাধর রোষকষায়িত লোচনে ভজহরির দিকে চেয়ে বলল, 'ভূতের মেনু আপনি কিছুই জানেন না। প্রায় রাতেই আমার মাংসের আখনি আজকাল ভূতে চেটেপুটে খেয়ে যাচ্ছে। তবে হ্যাঁ, তারা হাড়টাড় চিবোতে পারে না বলে সেগুলো ফেলে যায়।'

নবার বুড়ি মা এসে তাড়াতাড়ি ছেলেকে দু-হাতে আগলে ধরে বলল, 'ওগো, তোমরা ওসব অলক্ষুনে কথা বোলো না তো! বাছা আমার এমনিতেই ভিতুর ডিম। বাঘটাঘ নয় বাবারা, আমি জানি, নবাকে নিশ্চয়ই ডেঁয়োপিঁপড়ে কামড়েছে। বরাবর পিঁপড়ের কামড় খেয়ে ওই রকম করে চেঁচায়। নরম শরীর তো ব্যথা-বেদনা মোটেই সইতে পারে না।'

মায়ের হাত ধরে নবা বাড়ি ফিরল বটে, কিন্তু সারা সকাল ঘণ্টাদুয়েক টানা চেঁচানোর ফলে বিকেলের দিকটায় টের পেল, গলাটা ফেঁসে গিয়ে কেমন যেন ভাঙা আওয়াজ বেরোচ্ছে। সর্বনাশ আর কাকে বলে! টকাই ওস্তাদ এই গলা শুনলে কি আর পার্টটা তাকে দেবে? যথারীতি সন্ধেবেলা কালীকে পেন্নাম ঠুকে বেরিয়ে পড়ল নবা। টকাইয়ের বাড়িতে দুর্গাপদও এসে জুটে গেছে। তিনজনে মিলে ঠিক কী করতে হবে তা ভালো করে বুঝে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

উত্তরের জঙ্গল-রাস্তা বড় কম নয়। ঠান্ডাটাও আজ যেন জোর পেয়েছে। উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে জোর। রাত আটটার মধ্যেই গাঁ একেবারে নিঃঝুম। শীতের চোটে আর বাঘের ভয়ে রাস্তাঘাট শুনশান। তিনজনে পা চালিয়ে হেঁটে রাত ন'টার মধ্যেই উত্তরের জঙ্গলে পৌঁছে গেল। জ্যোৎস্না রাত নয়, তবে অন্ধকারেই তাদের চলাফেরার অভ্যাস বলে অসুবিধে হল না। জটাবাবার কুটিরের কাছাকাছি একটা ঝুপসি বটগাছ। তার আড়াল থেকে তারা জটাবাবার কুটিরে পিদিমের মিটমিটে আলোর আভাস দেখতে পেল।

টকাই দুর্গাপদকে একটা খোঁচা দিয়ে বলল, 'দুর্গা, এইবার।'

দুর্গাপদ মুখের কাছে দুই হাতের পাত ঠোঙা করে ধরে যে বাঘের ডাকটা ছাড়ল তা শুনলে বাঘ পর্যন্ত অবাক হয়ে যায়। কী গম্ভীর গর্জন রে বাবা। আকাশ বাতাস যেন প্রকম্পিত হয়ে গেল। টকাই নবাকে খোঁচা দিয়ে বলল, 'এবার তুই।'

তা নবার পার্টও কিছু খারাপ হল না। দিব্যি বাঘের ধরা মানুষের মতো সে গলা সপ্তমে তুলে চেঁচাতে লাগল, 'বাপ রে, মা রে, খেয়ে ফেলল, মেরে ফেলল...!' সেইসঙ্গে মুর্হুমুহু দুর্গার বাঘের ডাক।

বিস্তর বাঘ গর্জন আর মর্মন্তুদ আর্তনাদ করার পরও জটাবাবার কুটির থেকে কেউ উঁকি মারল না দেখে নবা মাথা চুলকে বলল, 'কী হল বলো তো ওস্তাদ! পার্টে কি কোনও ভুল হল?

দুর্গাপদ কাঁপা গলায় বলল, 'না রে, ভুল হয়নি। ওই যে...'

দুর্গাপদ যেদিকে আঙুল তুলে দেখাল, সেদিকে চেয়ে নবা এবার পার্ট ভুলে সত্যিকারের প্রাণভয়ে চেঁচাতে লাগল, 'ওরে বাপ রে, মেরে ফেলল রে, খেয়ে ফেলল রে...'

বাঘটা অবশ্য মোটেই উত্তেজিত হল না, তেমন ঘাবড়ালও না। জুলজুলে চোখে তাদের দিকে একটু চেয়ে থেকে, বোধ হয় দুর্গাপদকে মনে-মনে শাবাশ জানিয়ে একটা হাই তুলে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বাঘ চলে যাওয়ার পরও অবশ্য নবা চেঁচিয়েই যাচ্ছিল। টকাই একটা ধমক দিয়ে বলল, 'দ্যাখ নবা, বাঘেরও ঘেন্নাপিত্তি আছে। ওরা বেছেগুছেই খায়। তোর ঘাড় মটকালে কি ও ওর জাতভাইদের কাছে মুখ দেখাতে পারবে?'

নবা ধমক খেয়ে চুপ করল বটে, কিন্তু তার দাঁতে-দাঁতে ঠকঠকানিটা থামছিল না। সে কেঁপে-কেঁপে বলল, 'কিন্তু এ যে সত্যিকারের বাঘ ওস্তাদ!'

'তাতেই প্রমাণ হয় যে, তোরা দুজনেই পার্ট খুব ভাল করেছিস। কিন্তু পার্ট তো আর বাঘের জন্য করা নয়, জটাবাবা আর তাঁর শাগরেদের জন্য করা। তা সেখানে এত চেঁচামেচিতেও কোনও হেলদোল নেই যে!'

নবা মিয়োনো গলায় বলল, 'হয় বাঘের ডাক শুনে ভয়ে মূর্ছা গিয়েছেন, নয়তো বন্দুক বাগিয়ে আমাদের জন্য ওত পেতে আছেন।'

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেল, নবার কথাই সত্যি। জটাবাবা ঘরের একধারে অজ্ঞান হয়ে চিতপটাং পড়ে আছেন। তবে ভয়ে নয়, তাঁর মুখে-চোয়ালে-নাকে রক্ত আর কালশিটে। কে বা কারা বেধড়ক মেরে তাঁকে অজ্ঞান করে ফেলে গিয়েছে। কাঠের বাক্সটার ডালা খোলা, তার ভিতের সেই বেঁটে লোকটাও নেই। আর হিজিবিজিও নেই।

নবা চাপা গলায় বলল, 'ওস্তাদ, যারা এ লোকটাকে এরকম মেরেছে, তাদের গায়ে বোধ হয় খুব জোর, কী বলেন?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'তা হলে কি আমাদের এখানে থাকা ঠিক হচ্ছে? তারা যদি হঠাৎ করে ফিরে আসে, তা হলে আমাদের দেখে হয়তো খুব রাগ করবে।'

'তা তো করতেই পারে।'

'তা হলে আমাদের আর এখানে সময় নষ্ট করার দরকারটা কী? মা আজ কই মাছের পাতুরি করেছে। পইপই করে বলে দিয়েছে যেমন তাড়াতাড়ি ফিরি।'

টকাই অন্যমনস্কভাবে কী যেন ভাবতে-ভাবতে বলল, 'তা যাবি তো যা না। তবে কিনা তাদের সঙ্গে তো তোর পথেও দেখা হয়ে যেতে পারে! সেটা কি ভালো হবে রে নবা?'

নবা কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'মা অবশ্য বলেছে, জরুরি কাজ থাকলে একটু দেরি হলেও ক্ষতি নেই।'

ছয়

বেঁটে, কিম্ভুত, গোলগাল চেহারার লোকটা হেলেদুলে একটা আহ্লাদি দুলকি চালে হাঁটছে। পিছনে একটু তফাতে পাঁচু। লোকটা যে সুরেলা, অদ্ভুত সুন্দর শিসের শব্দ করছে, তাতে পাঁচুর যেন ঘুম-ঘুম ভাব হচ্ছে। যেন সে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে হাঁটছে। চারদিকে জ্যোৎস্নামাখা

কুয়াশায় যেন নানা স্বপ্নের ছবি ফুটে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। কী হচ্ছে তা বুঝতে পারছে না পাঁচু। কিন্তু কিছু একটা হচ্ছে, যা তার জীবনে আগে কখনও ঘটেনি। চারদিকে মায়াবী ওই শিসের শব্দের ঢেউ যেন ময়নাগড়কে এক অন্য জগৎ করে তুলছে।

খুব আবছা, স্বপ্নালু, ঘুম-ঘুম চোখে পাঁচু দেখতে পেল, বটতলার জংলা ঝোপঝাড়ের ভিতর থেকে একটা ছোট ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এসে যেন এই বেঁটে লোকটার হাত ধরে হাঁটতে লাগল। কে ও? যজ্ঞেশ্বর না? আরও একজন কে যেন পাশের পুকুর থেকে উঠে এসে পিছু নিল বেঁটে লোকটার। হ্যাঁ, পাঁচু একে চেনে। ও হল কলসি-কানাই।

কিন্তু এসব কী হচ্ছে? কেন হচ্ছে? পাঁচু একবার ভাবল, এসব স্বপ্ন। সে ফিরবার জন্য ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। এক আশ্চর্য চুম্বকের টানে সে ওর পিছু-পিছু মন্থর পায়ে হাঁটতে লাগল। ওই আশ্চর্য সুরে তার দু-চোখ বেয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। গানবাজনার সে কিছুই জানে না, তবু কেন যে এমন হচ্ছে!

হঠাৎ রাস্তা ছেড়ে ডান দিকে ঝোপঝাড়ের মধ্যে নেমে যাচ্ছিল বেঁটে মানুষটা। পাঁচু জানে ওখানে একটা পচা ডোবা আছে। তাতে থকথকে কাদা। পড়লে আর উঠতে পারে না কেউ। তাই সে চেঁচিয়ে বারণ করার চেষ্টা করল। কিন্তু গলা দিয়ে স্বরই বেরোল না।

কিন্তু ডোবায় পড়লে যে লোকটার ঘোর বিপদ হবে। তাই পাঁচু প্রাণপণে ছুটতে চেষ্টা করল। এমনিতে সে হরিণের মতো দৌড়তে পারে বটে, কিন্তু এখন পারল না। মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম সব তন্তু যেন আটকে ধরেছিল তাকে। তবু প্রাণপণে সব ছিঁড়েছুড়ে সে ছুটবার চেষ্টা করতে লাগল।

যখন গিয়ে ডোবার নাগালের ধারে পৌঁছোল, তখন শিসটা থেমে গিয়েছে। সামনে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ভিতরটা হায়-হায় করে উঠল পাঁচুর। লোকটা কি তবে ডুবেই গেল কাদায়?

সে মনস্থির করে ডোবায় ঝাঁপ দেবে বলে ঝোপঝাড়ের মধ্যে নামতেই কে যেন ফিসফিস করে বলে উঠল, 'কাজটা ঠিক হচ্ছে না।'

পাঁচু বলল, 'কে? কে তুমি?'

'ফিরে যাও।'

'লোকটা যে ডুবে গেল!'

'ফিরে যাও। নইলে বিপদ হবে।'

পাঁচু আর এগোল না। তবে মনটা বড় ভার হয়ে রইল। কথাটা কে বলল, তা অবশ্য সে বুঝতে পারল না। যজ্ঞেশ্বর কি? নাকি কলসি কানাই?

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফিরে আসছিল পাঁচু। নিজের বাড়ির কাছে আসতেই হঠাৎ একটা লম্বা লোক তার পথ আটকে দাঁড়াল।

'পাঁচু যে!'

পাঁচু খুব অভিমানের সঙ্গে বলল, 'হিজিবিজিদাদা, তুমি যে বোকা লোক খুঁজে বেড়াচ্ছিলে! বোকা লোক পেলেই নাকি কাজ দেবে! তা সেই থেকে আমি হাঁ করে তোমার জন্য বসে আছি। তুমি কোথায় হাওয়া হয়ে গেলে বলো তো!'

হিজিবিজি একগাল হেসে বলল, 'ওরে বাপু, হাওয়া হতে হয় কী আর সাধে! গা-ঢাকা না দিলে যে আমার বড় বিপদ হচ্ছে।'

'কী বিপদ হিজিবিজিদাদা?'

'বোকা লোক খুঁজছি শুনে আমার চারদিকে বোকা লোকের গাদাগাদি লেগে যাচ্ছিল যে। বুড়োশিবতলার হাটবারে তো একেবারে লাইন লেগে গেল। এ বলে, আমি সবচেয়ে বোকা, তো আর-একজন বলে, আমি ওর চেয়েও বোকা। আর-একজন বলল, 'ওরা আর কী এমন বোকা! আমার মতো বোকা ভূ-ভারতে নেই। আমি রোজ বাজার করতে যাই, কিন্তু রোজ আমাকে রাস্তার লোককে জিগ্যেস করে-করে বাজারের পথের হদিস জানতে হয়। আর বাড়ি ফেরার সময়ও তাই।' ফস করে পাশ থেকে একজন বলে উঠল, 'ওটা বোকামির লক্ষণ নয় লক্ষ্মণবাবু, ওটা ভুলো-মনের লক্ষণ। এই আমাকে দেখুন, এমন নিরেট বোকা পাবেন না। তিনের সঙ্গে দুই যোগ করলে যত হয় জিগ্যেস করলে বরাবর বলে এসেছি সাত।' পিছন থেকে আর-একজন বলল, 'তাতে কী? কেউ অঙ্কে কাঁচা হলেই কি বোকা হতে হবে নাকি? বরং আমার কথাই ধরুন, মুগবেড়ের গোহাটায় গরু কিনতে গিয়ে এক ফড়েবাজের সঙ্গে আলাপ হল। তা সে বলল, গরুর দুধের আজকাল চাহিদা নেই, উপকারও নেই। আসল জিনিস হল ছাগলের দুধ। গরু কিনে ঠকতে যাবে কেন, বরং আমার ছাগলটা নিয়ে যাও। দাম বরং ক'টাকা কমিয়ে দিচ্ছি। আমি এমন বোকা যে, তার কথার খপ্পরে পড়ে গরুর বদলে ছাগল কিনে ফেললুম।' একজন তাকে কনুইয়ের গুঁতোয় সরিয়ে দিয়ে বলল, আমি হলে গোরুর দাম দিয়ে বেড়াল কিনে আনতুম। ওরে বাপু, আসল বোকা ওকে বলে না, এই আমাকে দ্যাখো, আমার বউ বলে আমি নাকি বিশ্ব বোকা। নিখিল বঙ্গ বোকা সম্মেলনে আমি সেবার ফার্স্ট হয়েছিলাম।'''

পাঁচু গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমার তো এদের তেমন বোকা বলে মনেই হচ্ছে না।'

'খুব ঠিক কথা। আমারও মনে হচ্ছে না। যারা নিজেদের বোকা বলে বুঝতে পারে, তারা আবার বোকা কীসের? আসল বোকা হল সে-ই, যে নিজে বুঝতেই পারে না যে, সে বোকা।'

পাঁচু করুণ মুখ করে বলল, 'তা হলে আমার কী হবে হিজিবিজিদাদা? আমি যে বোকা, সেটা যে আমিও বুঝতে পারি!'

'সেই জন্যই তো তোমাকে বলছিলাম, সত্যিকারের বোকা লোক খুঁজে বের করা খুব কঠিন। ভগবান বোকা লোক মোটেই সাপ্লাই দিচ্ছেন না। তাই তো বুড়োশিবতলার হাট থেকে পালিয়ে বাঁচতে হল। তারপর থেকে গা-ঢাকা দিয়েই থাকতে হয়েছে। বোকা লোকরা কোমর বেঁধে খুঁজছে কিনা আমাকে!'

পাঁচু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'বোকা হয়েও সুখ নেই দেখছি।'

'তোমার দুঃখেরও কিছু নেই। তোমার মতো চালাকচতুর, চটপটে, চারচোখা ছেলের কাজের অভাব হবে না। তবে আমি এখন বোকা ছেড়ে মোটা লোক খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

'সে আবার কীরকম।'

'এই ধরো, বেশ গোলগাল মোটাসোটা চেহারার লোক। বেঁটে মতো হলে খুবই ভালো হয়। যদি সন্ধান দিতে পার, তবে হাতে-হাতে পঞ্চাশ টাকা নগদ পাবে।'

ঠোঁট উলটে পাঁচু বলে, 'এ গাঁয়ে মোটা লোকের অভাব কী? গদাধর মোটা, ভজহরিবাবু মোটা, বিষ্ণুবাবু মোটা...'

'আহা, ওদের কথা হচ্ছে না। যেমন-তেমন মোটা হলে চলবে না। মোটা-মোটা বেঁটে, বিটকেলপানা হলে ভালো হয়। তা সন্ধানে আছে নাকি?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাঁচু বলল, 'সন্ধান তো ছিল। কিন্তু সেই লোকটা যে মজা পুকুরের কাদায় ডুবে গেছে!'

'অ্যাঁ!' বলে একটা বুকফাটা চিৎকার দিয়ে উঠল হিজিবিজি। তারপর পাঁচুর কাঁধ ধরে একটা রাম-ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'সত্যি বলছ? কোথায় সেই মজা পুকুর?'

পাঁচু একটু ঘাবড়ে গিয়ে দু-পা পিছিয়ে বলল, 'সত্যি কথাই বলছি। নিজের চোখেই দেখা বলতে পার। একটু আগেই বিটকেল মানুষটা সটান গিয়ে পুকুরে ডুবেছে...'

তার হাতে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে হিজিবিজি বলল, 'চলো, চলো, শিগগির চলো। লোকটা বেহাত হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে যে!'

পাঁচুর হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে-টানতে প্রায় দৌড়তে-দৌড়তে হিজিবিজি বলছিল, 'সর্বনাশ হয়ে যাবে! কোথায় সেই মজা পুকুর?'

পাঁচু বিরক্ত হয়ে বলল, 'আহা, কোথায় আন্দাজে ছুটছ? পুকুর তো ডান ধারে।'

পুকুরের ধারে এসে তারা দেখল, চারদিকে গাছগাছালির ঘন ছায়ায় নিথর পুকুর। কোথাও কোনও হুটোপাটির শব্দও নেই।

হিজিবিজি ব্যস্তমনস্ক হয়ে বলল, 'পুকুর থেকে ওকে তুলতেই হবে। জলে নামো। এর জন্য টাকা দেব।'

পাঁচু বলল, 'পাগল নাকি? পুকুরে থকথকে কাদা, একবার নামলে আর উঠতে হবে না। জন্ম থেকে দেখে আসছি, এই পুকুরে কেউ নামে না। কলসি-কানাই তো এখানেই ডুবে মরেছিল।'

হিজিবিজি হাসিখুসি ভাবটা উবে গেছে। সে কঠিন গলায় বলে, 'ওসব শুনতে চাই না। লোকটাকে পুকুর থেকে তুলতেই হবে। আমার কাছে ভালো নাইলনের দড়ি আছে। তোমার কোমরে বেঁধে দিচ্ছি। পুকুরে নামো, বিপদ বুঝলে আমি টেনে তুলব।'

পাঁচু পিছিয়ে গিয়ে বলে, 'এই ঠান্ডায় আমি পুকুরে নামতে পারব না হিজিবিজিদাদা। নামতে হলে তুমি নামো।'

হিজিবিজি হঠাৎ লোহার মতো শক্ত হাতে তার ঘাড়টা চেপে ধরে মাথায় একটা রামগাট্টা বসিয়ে দিয়ে বলল, 'ভালো কথায় কাজ না হলে তোর বিপদ আছে। ছুড়ে পুকুরে ফেলে দেব।'

পাঁচু বুঝতে পারল, হিজিবিজিকে সে যত ভালোমানুষ মনে করেছিল, তত ভালোমানুষ ও নয়। গাট্টার চোটে তার মাথা ঝিমঝিম করে চোখে অন্ধকার দেখে বসে পড়ল মাটিতে।

হিজিবিজি কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা লম্বা নাইলনের দড়ি বের করে পাঁচুর কোমরে এক প্রান্ত বেঁধে দিয়ে বলল, 'যাও আর সময় নষ্ট কোরো না। কথা না শুনলে কিন্তু বিপদ হবে।'

পাঁচু তবু ইতস্তত করতে লাগল। হিজিবিজি সোজা তার ঘাড় ধরে দাঁড় করিয়ে পুকুরের ধারে গিয়ে প্রচণ্ড একটা ধাক্কায় জলে ফেলে দিল।

বরফের মতো ঠান্ডা জলে পড়ে গিয়ে পাঁচু 'মা গো' বলে চেঁচিয়ে উঠল প্রথমে। তারপর পাগলের মতো হাত-পা ছুড়তে লাগল। উপরে খানিকটা জল থাকলেও জলের দু-তিন ফুট

নীচে ভসভসে কাদায় গেঁথে গেলে আর কিছু করার থাকে না। হিজিবিজি পুকুরের ধার থেকে কঠিন গলায় আদেশ দিল, 'ডুব দাও। ডুব দিয়ে-দিয়ে খোঁজো লোকটাকে। দেরি কোরো না, তা হলে মরবে।'

কিন্তু জলে-কাদায় ডুবন্ত মানুষ খুঁজবে কী, পাঁচুর নিজের প্রাণই রক্ষা করা দায়। সাঁতার সে খুবই ভালো জানে বটে, কিন্তু এই হাজামজা কাদার পুকুরে সাঁতার জেনে হবে কোন অষ্টরম্ভা? পাঁচু ভেসে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল বটে, কিন্তু উপর থেকে একটা গাছের শুকনো ডাল দিয়ে তার মাথায় একটা ঘা মেরে হিজিবিজি বলল, 'ডুব দাও। ডুব না দিলে তুলবে কী করে লোকটাকে?'

অগত্যা ডুব দিতে হল পাঁচুকে। আর ডুব দিতেই হল বিপত্তি। আর এই সাঙ্ঘাতিক ঠান্ডায় হাত-পা অসাড় হয়ে আসছিলই। ডুব দেওয়ার পর নীচেকার কাদামাটি ঘুলিয়ে উঠে নাকে-মুখে ঢুকে যাচ্ছিল। নীচের কাদায় বসে যাচ্ছিল কোমরসুদ্ধ পা। চেষ্টা করেও পাঁচু আর উপর দিকে উঠতে পারছিল না। তার উপর দমও ফুরিয়ে আসছে।

মরতে আজ খুব একটা দুঃখ হচ্ছে না পাঁচুর। এতদিনে সে বুঝতে পেরেছে এই অনাদরে, অপমানে বেঁচে থাকার মানেই হয় না। মরে বরং ভূত হয়ে দিব্যি গাছে-গাছে ঘুরে বেড়ানো যাবে। সেও একরকম ভালো। তাই আকুপাকু করলেও ভিতরে তেমন হায়-হায় করছিল না।

ঠিক এই সময় তার কানের কাছে কে যেন বলে উঠল, 'দূর বোকা, আহাম্মক কোথাকার! ডান দিকে কোনাকুনি এগোতে থাক।'

কে বলল কে জানে। তবে বিকার অবস্থায় লোকে অনেক ভুল দ্যাখে, ভুল শোনে। সেরকম কিছু হবে বোধ হয়। তবে সে ডানদিকে ফেরার একটা চেষ্টা করল। হাত-পা প্রবলভাবে নাড়ানাড়ি করায় একটু এগিয়েও গেল সে।

কে যেন বলল, 'এবার মাথা তোলা দে।'

তাই দিল পাঁচু। মাথাটা ভুস করে জলের উপর ভেসে উঠল। সে দেখতে পেল, জলের মধ্যে হোগলার জঙ্গলের আড়ালে পড়েছে সে। হিজিবিজি তাকে দেখতে পাচ্ছে না। আর আশ্চর্যের ব্যাপার, তার পায়ের নীচে শক্ত মাটি ঠেকছে। সে কোমরের দড়িটা খুলে ফেলে সন্তর্পণে জল থেকে উঠে জঙ্গলের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে ঠাহর করে দেখল, হিজিবিজি দড়িটা টেনে দেখছে। তারপর চাপা গলায় একটা হুঙ্কার দিয়ে তার ব্যাগ থেকে একটা কিছু বের করে এদিক-ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। তাকেই খুঁজছে বোধহয়।

কানে-কানে কে যেন ফের চাপা গলায় বলে উঠল, 'জল ছেড়ে উঠো না, মরবে। ডান দিকে এগিয়ে যাও।'

তাই এগোল পাঁচু। আশ্চর্যের বিষয়, পুকুরে জলের নীচে একটা সরু কার্নিসমতো রয়েছে। সেই কার্নিস ধরেই জল ভেঙে এগোতে-এগাতে সে জলে গজিয়ে ওঠা নানা আগাছার গভীর জঙ্গলে ঢুকে গেল। তারপর পা বাড়িয়ে অনুভব করল, কার্নিসটা বাঁক নিয়েছে। আর বাঁকের মুখটায় একটা বড় নালার বাঁধানো মুখ।

ভাবনাচিন্তার সময় নেই। পাঁচু একটু হামাগুড়ি দিয়ে নালার মুখে ঢুকে পড়ল। নালার মধ্যে হাঁটুজলের বেশি নয়। তবে কাদাটাদা নেই। দিব্যি হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল সে। একটু পরেই নালাটা যেখানে শেষ, সেটা একটা বেশ বড়সড় চৌবাচ্চার মতো জায়গা। মাথা তুলে দাঁড়াতেও কোনও অসুবিধে নেই। হাতড়ে-হাতড়ে অন্ধকারে পাঁচু আন্দাজ করল, এটা একটা বড় চৌবাচ্চাই বটে। বেশ উঁচু কানা। তবে একধারে উপরে ওঠার সরু সিঁড়ি আছে। পাঁচু সেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল।

আশ্চর্যের বিষয়, যেখানে উঠে এল সেটা একটা বেশ বড়সড় ঘর। ঘরের ভিতরে একটা সোঁদা গন্ধ। কত বড় ঘর বা ঘরে কী আছে তা অন্ধকারে দেখা গেল না। পাঁচুর বেশ শীত করছিল। গায়ের জামাটা খুলে নিংড়ে নিল সে। তারপর সেটা দিয়ে মাথা আর গা মুছে নিল। অন্ধকারে চারদিকটা ঠাহর করার চেষ্টা করছিল সে। কিন্তু অন্ধকারে চারদিককার আন্দাজ পাওয়া মুশকিল।

হঠাৎ বাঁ-দিক থেকে একটা ভারী চাপা কাতর ধ্বনি শুনতে পেল সে। যেন কেউ খুব ব্যথা বা বেদনায় ককিয়ে উঠছে। পাঁচু ভয় পেল না। সহজে ভয় পায়ও না সে। চাপা গলায় বলল, 'কে, কে গো তুমি?'

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর হঠাৎ চারদিকে একটা ঢেউ তুলে একটা ভারী সুরেলা শিসের শব্দ ভেসে এল। সেই বেঁটে, মোটা, গোল চেহারার লোকটাই তো শিস দিয়েছিল কিছুক্ষণ আগে! তবে কি লোকটা বেঁচে আছে? পুকুরে ডুবে মরেনি?

শিসের শব্দ লক্ষ করে মাঝখানে এগিয়ে গেল পাঁচু। একবারে কাছে গিয়ে হাত বাড়াতেই মানুষের শরীরের স্পর্শ পেল সে। শিসটা থেমে গেল হঠাৎ।

পাঁচু কোমল গলায় বলল, 'তুমি কে?'

লোকটা বলল, 'হিজিবিজি।'

'তুমিই হিজিবিজি?'

লোকটা ফের বলল, 'হিজিবিজি।'

'আমি তোমার কাছে একটু বসব?'

'হুঁ।'

পাঁচু বসল মেঝের উপর, পাশাপাশি। লোকটা ফের শিস দিতে লাগল। পাঁচু দুনিয়া ভুলে মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগল, এমন সুন্দর সুর সে কখনও শোনেনি।

চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দেওয়ায় লোকটার জ্ঞান ফিরল। তবে চোখ চাওয়ার আগেই তিনি কাতর গলায় 'মাগো', বাবা গো' করে কিছুক্ষণ ছটফট করলেন। তারপর চোখ চেয়ে লোকজন দেখে ভেউ-ভেউ করে কেঁদে উঠে বললেন, 'আমার দেহে কি প্রাণটা এখনও আছে, নাকি বেরিয়ে পড়েছে?'

টাকই খুব মন দিয়ে জটাবাবার দাড়ি-গোঁফের মধ্যে লুকনো ধূর্ত মুখটা দেখে নিচ্ছিল। বলল, 'বাবাজির যে প্রাণের বড় মায়া দেখছি! তা প্রাণ নিয়ে এরকম টানাহ্যাঁচড়া পড়ল কেন? আপনার ওই ঢ্যাঙাপানা স্যাঙাতটাই বা গায়েব হল কোথা?'

জটাবাবা কাতরাতে-কাতরাতে বললেন, 'ওই কমণ্ডলু থেকে মুখে আগে একটু জল দাও দিকি। গলাটা কাঠ হয়ে আছে।' টকাইয়ের ইশারায় নবা গিয়ে কমণ্ডলু নিয়ে এল। ঢকঢক করে খানিক জল খেয়ে জটাবাবা কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসে চারদিকে খোলা চোখে চেয়ে দেখলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।'

টকাই সায় দিয়ে বলে, 'বটেই তো। বাঃ, বাবাজির মুখ থেকে বেশ ভালো-ভালো কথা বেরোয় তো! তা দিব্যদৃষ্টিটা খুলল কী করে বাবাজি? রদ্দা খেয়ে নাকি?'

কাহিল গলাতেও একটা হুংকার ছাড়ার চেষ্টা করে বাবাজি বললেন, 'রদ্দা মেরে পালাবে কোথায়? এমন মারণউচাটন ঝাড়ব যে, লাট খেয়ে এসে এইখানে পড়ে মরবে। মুখে রক্ত উঠবে না? জোর পেয়ে দুম করে ঘুসো বসিয়ে দিয়েছিল বটে, কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তা কার এমন আস্পদ্দা হল যে, আপনাকে ঘুসো মেরে চলে গেল?'

জটাবাবা স্তিমিত চোখে টকাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমি কে বলো তো! মুখখানা চেনা-চেনা ঠেকছে।'

নবা গদগদ গলায় বলে, 'আহা, একে চিনতে পারছেন না বাবাজি? এ যে টকাই ওস্তাদ! এই তো সেদিন দুজনে আপনাকে নমো ঠুকে গেলুম! এর মধ্যেই ভুলে গেলেন?

জটাবাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ওরে, কতজনাকে আর মনে রাখব? যজমান কি আমার একটা দুটো? সারা পৃথিবীতে লাখো-লাখো ছড়িয়ে আছে যে। তা তুই কি চোর-ডাকাত নাকি?

'আমি চোর-ডাকাত হলে কি আপনার কিছু সুবিধে হয় বাবাজি?'

জটাবাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে বললেন, 'তা জানি না বাপু। মারধর খেয়ে মাথাটা বড্ড ঝিমঝিম করছে। কিছুই তেমন মনে পড়ছে না।'

টকাই মিষ্টি করে জিগ্যেস করে, 'আপনি সাধু-সন্নিসি মানুষ, সাধনভজন নিয়ে থাকেন, আপনাকে তো মারধর করার কথা নয়। বলি গুপ্তধনটনের খবর আছে নাকি আপনার কাছে?'

জটাবাবা মাথা নেড়ে বললেন, 'না রে বাপু, গুপ্তধন নয়।'

'তবে কী?'

'কিছু মনে পড়ছে না রে বাপু। মাথাটা বড্ড গুলিয়ে গেছে।'

'ওই বড় বাক্সটার মধ্যে যে কেষ্টর জীবটাকে পুরে রেখেছিলেন, তার কী ব্যবস্থা করেছেন বলুন তো বাবাজি! মেরেটেরে ফেলেছেন নাকি? তা হলে বলতে হয় আপনি সাধুবেশে অতি পাষণ্ড লোক।'

জটাবাবা জুলজুলে চোখে টকাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'ওসব আমি কিছু জানি না বাপু, মদনা জানে।'

'মদনা, সে আবার কে?'

জটাবাবা এবার নিজেই কমণ্ডলু তুলে খানিক জল খেয়ে বললেন, 'মদনা যে কে তাও কি ছাই জানি!'

'মদনা আপনার চেলা নাকি?'

জটাবাবা মাথা নেড়ে বলেন, 'না। বিষ্ণুপুরের বটতলায় আস্তানা গেড়েছিলুম। সেইখানেই এসে জুটল খুব চালাক-চতুর লোক। মেলা ভেলকিও জানে দেখলাম। বলল, তাকে নাকি পুলিশ ঝুটমুট হয়রান করছে, একটু গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে চায়। তা আমি

সাধু-ফকির মানুষ, আমার আর কাকে ভয়? তাই নিলুম সঙ্গে জুটিয়ে। তারপর ঘুরতে-ঘুরতে এই ময়নাগড়ের জঙ্গলে। এর বেশি কিছু আমি জানি না বাপু।'

'কিন্তু বাবাজি, জানলে ভালো করতেন। ওই বাক্সটার মধ্যে যাকে পুরে রেখেছিলেন, সে কিন্তু কোনও জন্তু-জানোয়ার নয়। দেখতে বিটকেল হলেও, সে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার লোকও নয়। তাকে দিয়ে কী করানোর মতলব ছিল আপনার বলুন তো?'

'সেসব মদনা জানে। আমাকে জিগ্যেস করে লাভ নেই।'

'তাকে পেলেন কোথায়? সেটাও কি মদনা জানে? আর মদনাই যদি সব জানে, তা হলে আপনি বাবাজি কি চোখ উলটে ছিলেন? আমি নিজের চোখে রোজ রাত্তিরে ওই বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখেছি, আপনারা দুটি পাষণ্ড মিলে মানুষটার উপর কী অত্যাচারটাই না করেন। ঝেড়ে কাশুন তো বাবাজি, আপনারা আসলে কারা, আর মতলবটাই বা কী?'

নবা আর দুর্গাপদ এতক্ষণ কথা কয়নি। নবা এবার একটু গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, 'ওস্তাদ, আপনি শিল্পী মানুষ, জীবনে কখনও মোটাদাগের কাজ করেননি। জটাবাবাকে পাঁচ মিনিটের জন্য আমার আর দুর্গাপদর হাতে ছেড়ে দিয়ে আপনি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়ান। আমরা জিব টেনে কথা বের করে আনছি।'

জটাবাবা জুলজুল করে নবা আর দুর্গাপদকে জরিপ করে নিলেন। তিনি রোগাভোগা লোক, আর এ-দুজন পেল্লায় জোয়ান। কমণ্ডলু থেকে আর-একটু জল গলায় ঢেলে জটাবাবা বললেন, 'তিষ্ঠ রে পাপিষ্ঠ, আমি কিন্তু মারণউচাটন জানি।'

নবা বলল, 'সে আমরাও জানি। আপনার মারণউচাটনের চেয়ে আমাদেরটায় আরও ভালো কাজ হয়, দেখবেন? ওস্তাদ, যান, একটু ফাঁকায় গিয়ে দাঁড়ান। ইদিকে কান দেবেন না। পাঁচ মিনিট পর দেখবেন বাবাজির মুখ থেকে হড়হড় করে কথা বেরোচ্ছে।'

একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে টকাই বলল, 'যা ভালো বুঝিস কর। তবে প্রাণে মারিস না বাপু। আর দেখিস, যেন মেলা চেঁচামেচি না করে। আর্তনাদ জিনিসটা আমি সইতে পারি না।'

'তাই হবে ওস্তাদ।'

জটাবাবা ঘ্যাসঘ্যাস করে মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বললেন, 'ভালো কথাই তো বললুম বাপু। তবু বিশ্বেস হচ্ছে না কেন বলো তো! কিছু ভুল বলেছি বলেও তো মনে হচ্ছে না। এসময় মদনাটাই বা গেল কোথায়? এদিকে যে আমার বেজায় বিপদ। এই জন্যই তাকে পইপই করে বলেছিলুম, 'ওরে, এই বিটকেল ফুটবলের মতো জীবটাকে ছেড়ে দে।' তা বলে কিনা, ওটা নাকি অন্য কোন গ্রহ-নক্ষত্রের জীব। বেচলে মেলা টাকা পাওয়া যাবে।'

টকাই বলল, 'এই তো কথা বেরোচ্ছে দেখছি। তা বিটকেল জীবটাকে পেলেন কোথায়?'

দুখানা হাত উলটে হতাশার ভঙ্গি করে জটাবাবা বললেন, 'আমি কোথায় পাব? অত সুলুকসন্ধান কি জানি! তবে শুনেছি, ময়নাগড়ের রাজবাড়ির ভিতরে লুকিয়ে ছিল। মদনা তাকে উদ্ধার করে আনে।'

'আপনার চেলার নাম মদনা নাকি?' জটাবাবা বললেন, 'আসল নাম জানি না বাপু। যে নামটা বলেছিল, সেটাই বলছি। তবে সে আমার চেলাটেলা নয়।'

'আপনাকে মারধর করল কে?'

মাথা নেড়ে জটাবাবা বললেন, 'জানি না। ক'দিন যাবৎই কারা যেন ঘুরঘুর করছে আশপাশে। তাদের দেখাও যায় না, শোনাও যায় না, কিন্তু কেমন যেন টের পাওয়া যায়। খানিকটা অশরীরীর মতো। তা মদনকে কথাটা বলতেই সে বলল, 'আমিও টের পেয়েছি, একটু সাবধান থাকুন।' তা সাবধান আর কী থাকব বাবা, অশরীরীর হাত থেকে কি আর কারও রেহাই আছে? নিশুতি রাতে শুনতে পেতাম, কারা যেন আশপাশে ঘুরছে, গাছ ঝাঁকাচ্ছে। প্রায়ই দেখতুম, সকালের দিকে হরিণছানারা এসে ঘরে ঢুকে ওই কাঠের বাক্সটার কাছে বসে আছে। মেলা রংবেরঙের প্রজাপতি এসে বসে থাকত বাক্সটার গায়ে। বাঁদরের পাল এসে নানারকম বুনো ফল বাক্সটার কাছে রেখে চলে যেত। এসব অশৈলী কাণ্ড দেখে বড় ভয় পেতুম।'

তা হলে আপনি আর আপনার স্যাঙাত, দুই পাষণ্ড মিলে ওই কেষ্টর জীবের উপর অত্যাচার করতেন কেন?'

'বলছি বাবা, বলছি। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তিরও আমাকে করতে হবে। মদনা বলেছিল, হিজিবিজি নাকি এমন সুন্দর শিস দিতে পারে, যা শুনে স্বর্গের দেবতারাও নেমে আসতে পারে। সেই শিস শুনলে নাকি মানুষের পূর্বজন্মের স্মৃতি ফিরে আসতে চায়। মদন নাকি একবার আড়াল থেকে সেই শিস শুনে প্রায় মূর্ছা গিয়েছিল। কিন্তু দুঃখের কথা হল, হিজিবিজিকে ধরে আনার পর শত চেষ্টাতেও তাকে শিস দেওয়াতে পারিনি আমরা। কত আদর করে বাবা-বাছা বলেও পারিনি। শেষে আমাদের যেন মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল। তাই খ্যাপা রাগে অত্যাচার করে ফেলেছি। এখন নিজের উপর বড় ঘেন্না হচ্ছে বাবারা।'

'বাবাজির কি অনুতাপও হচ্ছে নাকি?'

'হচ্ছে, হচ্ছে। অনুতাপ তুষানল, দগ্ধে-দগ্ধে মারে। মারধর করো, সইবে। কিন্তু অনুতাপ বড় সাঙ্ঘাতিক জিনিস। ভিতরটা আংরা করে দেয়।'

'ওর নাম কি হিজিবিজি?'

'তা জানি না। মাঝে-মাঝে শুধু বলত, হিজিবিজি, হিজিবিজি।'

'তারপর কী হল বলুন।'

'বলছি, বাবা, বলছি। আজ সকালবেলায় মদন যেন কোথায় বেরোল। একা বসে সাধনভজনের চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু আজ বড় গা ছমছম করছিল। কোথা থেকে একটা বোঁটকা গন্ধ আসছিল। বাইরে মাঝে-মাঝে কেমন যেন অদ্ভুত হাওয়ার শব্দ হচ্ছে। শুকনো পাতার উপর পা ফেলে কারা যেন হাঁটছে। বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে কত দিন আর কত রাত কাটিয়েছি, কিন্তু আজকের মতো এরকম অস্বস্তি কখনও হয়নি। মনে হচ্ছিল,

আজ একটা কিছু ঘটবে। আমাকে পাষণ্ডই ভাবো কিংবা যাই ভাবো বাপু, সাধু হওয়ার জন্যই কিন্তু সংসার ছেড়েছিলুম। শেষ অবধি সাধু হতে পারিনি, ভেক ধরে ঘুরে বেড়াই। তবু লোকটা আমি তেমন খারাপ ছিলুম না হে। একটু মনুষ্যত্ব যেন এখনও আছে। তাই আজ সন্ধেবেলায় ভাবলুম, হিজিবিজিকে এরকমভাবে আটকে রেখে বড্ড পাপ হচ্ছে। কিন্তু ছেড়ে দিলে যদি বাঘে খায়, কি বুনো কুকুরে ধরে, সেই ভয়ে ছাড়তেও দনোমনো হচ্ছিল। তারপর ভাবলুম, ওই বন্দিদশা থেকে তো আগে মুক্ত করি, ছাড়ার কথা পরে ভাবা যাবে। মনটা স্থির করে বাক্সের ডালা খুলে দিয়ে বললুম, 'বাবা হিজিবিজি, দোষঘাট নিও না, তোমার প্রতি বড় অত্যাচার-অবিচার করেছি, আজ ক্ষমা করে দাও।'''

'তারপর?'

'হিজিবিজি কী বুঝল, কে জানে!' তবে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল। তারপর চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে গুটগুট করে বেরিয়ে গেল।'

'সত্যি বলছেন তো?'

'সত্যি বলছি বাবা, মারো, কাটো যা খুশি করো, মিথ্যে বলব না। হিজিবিজি চলে যাওয়ার পর মাথাটা একটু থিতু হল। ভালো করলাম না মন্দ করলাম কে জানে। মদন হয়তো এসে আমাকে খুনই করবে। তবু যা ভালো বুঝেছি, করেছি।'

'তারপর কী হল?'

জটাবাবা শুকনো ঠোঁট জিব দিয়ে চেটে মিয়ানো গলায় বললে, 'খুব দুশ্চিন্তাও হচ্ছিল। এই জঙ্গলে মাঝে-মাঝে বাঘ ঘুরে বেড়ায়, বুনো কুকুরও আছে। তাদের পাল্লায় পড়লে হিজিবিজি চোখের পলকে শেষ হয়ে যাবে। এই সব ভেবে সাধনভজনে মন বসাতে পারছিলাম না। হঠাৎ শুনি, বাইরে থেকে একটা অদ্ভুত সুন্দর শিসের শব্দ হচ্ছে। সে এমনই সুর, প্রাণ যেন আনচান করে ওঠে। মনে হয় যেন, স্বর্গের দেবতাদেরই বোধহয় আগমন ঘটেছে। কী বলব বাবারা, আমার চারদিকে বাতাসটাও যেন নেচে উঠেছিল সেই সুরে। পাগলের মতো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু দরজায় থমকে দাঁড়াতে হল, যা দৃশ্য দেখলাম, জন্মেও ভুলব না।'

'কী দেখলেন বাবাজি?'

জটাবাবার চোখ দুটো যেন হঠাৎ স্বপ্নাতুর হয়ে গেল। ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে খানিক চেয়ে থাকলেন। চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়ছে। লিত কণ্ঠে বললেন, 'যারা জন্মের তপস্যাতেও ও জিনিস দেখিনি, দেখলাম, হিজিবিজি দুলে-দুলে হাঁটছে। আর তার পিছনে চলেছে রাজ্যের জন্তু-জানোয়ার। দুটো হরিণ, একটা বাঘ, কয়েকটা খরগোশ, আরও কী

কী যেন! পোষমানা জীবজন্তুর মতো হিজিবিজির সঙ্গে চলেছে, একটু পরে তারা অন্ধকারে মিলয়ে গেল।'

'তারপর কী হল বাবাজি?'

'ওই কাণ্ড দেখে নিজের উপর বড় ঘেন্না হল বাবা। সাধনভজন করি, কিন্তু কই, বুনো জন্তুরা তো কখনও পোষ মানেনি আমার! তবে কি ওই হিজিবিজি আসলে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর কেউ? যদি তাই হয়ে থাকে, তবে তো আমার বড় অধর্ম হয়েছে! আত্মগ্লানি আর অনুশোচনায় বসে-বসে তাই চোখে» জল ফেলছিলাম। এমন সময় একটা মাঝবয়সি লোক কোথা থেকে এসে উদয় হল। পাকানো চেহারা, চোখ যেন ধকধক করে জ্বলছে। ঘরে ঢুকেই হাঁক মেরে বলল, 'কই, কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস আমার হিজিবিজিকে?' আমি থতমত খেয়ে বললুম, 'সে নেই। চলে গিয়েছে।' লোকটা এ কথায় ভারী অবাক হয়ে বলল, 'সর্বনাশ! কোথায় গেছে?' মাথা নেড়ে বললুম, 'জানি না।' তারপর লোকটা হঠাৎ তেড়ে এসে আমার উপর চড়াও হল। কী মার! কী মার! প্রথম কয়েকটা ঘুসো খেয়েও জ্ঞান ছিল। তারপর কিছু মনে নেই।'

'লোকটা কে?'

'তা কী করে বলব বাবা! হেঁটো ধুতি, গায়ে একটা জামা আর চাদরের মতো কিছু ছিল। গোঁফ আছে। বাবুগোছের লোক নয়, গতরে খেটে খাওয়া লোক। রাগের চোটে যেরকম ফুঁসছিল, তাতে আমাকে যে খুন করেনি সেটাই ভাগ্যি।'

'এবার যে আপনাকে গা তুলতে হবে বাবাজি। চলুন।'

'কোথায় যেতে হবে বাপু?'

'তা জানি না। তবে হিজিবিজিকে খুঁজে বের না করলেই নয়। আপনার কথা শুনে যা বুঝেছি, তাতে মনে হয়, আপনার স্যাঙাত মদনা খুব ভালো লোক নয়। হিজিবিজি যদি ফের তার খপ্পরে পড়ে, তা হলে তার কপালে দুঃখ আছে।'

জটাবাবা মাথা নেড়ে বললেন, 'তা বটে। শুনেছি হিজিবিজিকে বিক্রি করলে সে নাকি মোটা টাকা পাবে। কয়েক লাখ।'

'বাবাজি, অভয় দেন তো একটা কথা কই।'

'বলো বাপু।'

'আপনাদের দুজনের কাছেই বন্দুক-পিস্তল আছে। কেন বলুন তো? বন্দুক-পিস্তলও কি সাধনভজনে লাগে?'

জটাবাবার মুখখানা হঠাৎ যেন ফ্যাকাসে মেরে গেল। আমতা-আমতা করে বললেন, 'সে আমার জিনিস নয় বাপু। মদনার জিনিস।'

'আপনি বন্দুক চালাতে পারেন?'

'মদনাই একটুআধটু শিখিয়েছে। তবে বাপু সত্যি কথাই বলি, ওসব আমি পছন্দ করি না।'

'আপনি কি বলতে চান, আপনি খুব ভাল মানুষ! যত দোষ ওই মদনার? যাকগে, আপনাকে আর জ্বালাতন করতে চাই না। উঠুন। নবা কম্বলটম্বর সরিয়ে বন্দুকটন্দুক যা পাস বের কর তো। থানায় জমা করতে হবে।'

সাত

শ্যামাচরণকে কোথাও খুঁজে দেখতে বাকি রাখল না শিবেন। নিবু-নিবু টর্চের আলোয় সাধ্যমতো আগাছা জর্জরিত রাজবাড়ির বাগানের ঝোপ-জঙ্গলেও খুঁজল। খুঁজতে-খুঁজতে পরিশ্রমে গা গরম হয়ে ঘামতে লাগল সে। ভজহরিকে শিবেন বড়ই ভয় পায়। ভজহরির গায়ের জোর বেশি, বুদ্ধির জোর বেশি, মনের জোর বেশি। কোনওদিকেই সে ভজহরির সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি। শুধু লেখাপড়ায় ভজহরি তার চেয়ে একটু পিছিয়ে। আর ভজহরি সেই জন্যই শিবেনকে এত হিংসে করে। নইলে খুঁজে-খুঁজে এই অজ পাড়াগাঁয়ে শিবেনের খোঁজে এসে হাজির হত না। তবে ভজহরি যখন এসেছে, তখন শিবেনকে বিপাকে ফেলবেই। ভয়ে শিবেনের বুক ধুকপুক করছে। ভজহরির অবাধ্য হওয়ার সাধ্যই নেই তার। ভজহরির আদেশ না মানলে কোনদিক দিয়ে কোন বিপদ আসবে, তা কেউ জানে না।

পিস্তল দিয়ে কিভাবে চাপ সৃষ্টি করতে হয়, তা শিবেন জানে না। শুধু জানে, মানুষ বন্দুক-পিস্তলকে ভয় পায়। আশা করা যায়, শ্যামাচরণও পাবে। যদি পায়, তা হলে শ্যামাচরণের কাছ থেকে পানিঘরের হদিশ জেনে নেওয়া তেমন কঠিন হবে না। আর পানিঘরের হদিস না দিতে পারলে ভজহরি খুব রেগে যাবে। আর ভজহরি যত রেগে যাবে, ততই বাড়বে শিবেনের বিপদ।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক হন্যে হয়ে ঘোরাঘুরির পর শিবেন ক্লান্ত হয়ে শিমুল গাছটার তলায় শিশিরে ভেজা ঘাসের উপর একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল। গভীর রাতে আকাশে একটু ভুতুড়ে জ্যোৎস্না ফুটেছে। তাতে বাগানে একটা ভারী আলোআঁধারির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু মনটা বড় উচাটন। বাগানের সৌন্দর্য দেখার সময় নেই শিবেনের। উঠতেই যাচ্ছিল, হঠাৎ বাঁ-দিকের লোহার ফটকে একটা শব্দ পেয়ে শিবেন টান হল। শ্যামাদা এল নাকি?

না, শ্যামাদা নয়। ঢ্যাঙামতো একটা লোক ফটক দিয়ে ঢুকে হনহন করে বাগান পেরিয়ে রাজবাড়ির দিকে আসছে। শিবেন একটু অবাক হল। এ বাড়িতে সন্ধেবেলা একবার চোরের আগমন হয়েছে। তারপর ভজহরি হানা দিয়েছে। এখন আবার এই ঢ্যাঙা লোকটাও কি তার থিসিসের সন্ধানে এসে জুটল? শিবেনের থিসিসের খবর এমন রটে গেল কী করে, সেটাই সে ভেবে পাচ্ছে না। অবশ্য ফুল ফুটলে তার গন্ধ ছড়াবেই, তাকে তো আর আটকানো যায় না। শিবেন এও জানে যে, এই থিসিস প্রকাশিত হওয়ার পর বিজ্ঞানে নতুন দিগন্ত ঘুলে যাবে। আপাতত এটাকে রক্ষা করা ক্রমশ কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

শিবেন বাঁ-বগলে শক্ত করে থিসিসের ফাইলটা চেপে ধরে ডান হাতে পিস্তল বাগিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে গাছগাছালির ছায়ায় লোকটার পিছু নিল। বাড়ির পিছনের ভাঙা জানলাটার কাছে গিয়ে থামল লোকটা। তারপর কুককুক করে তিনবার একটা সাংকেতিক শিস দিল। জানলার পাল্লাটা সরিয়ে কে যেন ভিতর থেকে ঝুঁকে কি একটা বলল।

কী কথাবার্তা হয় তা জানার জন্য একটু এগিয়ে গেল শিবেন।

বাগানে ঝোপঝাড়ের অভাব নেই। গা-ঢাকা দেওয়ার খুব সুবিধে। তাই শিবেনের কোনও অসুবিধেই হল না। দুজনের বেশ কাছাকাছিই এগিয়ে যেতে পারল সে। তার থিসিস সম্পর্কে এরা কতটা কি জানতে পেরেছে সেটা জানা শিবেনের একান্তই দরকার।

ঢ্যাঙা লোকটা চাপা গলায় বলছিল, 'সন্ধান পেয়েছ?'

'আরে না, তবে পানিঘরেই গিয়ে ঢুকেছে মনে হয়। না হলে মজাপুকুরে ডুবে মরেছে। খুব মুশকিল হয়ে গেল। পালাল কী করে? জটাই তো পাহারায় ছিল।'

'তা ছিল, তার কাছে তার মেশিনগান অবধি ছিল। কিন্তু হানাদার সাজ্ঘাতিক ধূর্ত। আচমকা ঢুকেই মেরে বসে। জটাই হাতখানা পর্যন্ত তোলার সময় পায়নি। পানিঘরের সন্ধান পেলে?'

'না, সারা বাড়ি ঘুরে কোথাও পথ পেলাম না। এর মধ্যে ওই হাবা গঙ্গারাম শিবেনমাস্টারটাও এসে হাজির হয়েছিল। তাপ্পি দিয়ে একটা খেলনা পিস্তল ধরিয়ে দিয়ে

তাড়িয়েছি।'

'শিবেনমাস্টার! সে আবার এসে জুটল কেন?'

'কী যেন ছাইভস্ম থিসিসের কথা বলছিল। আমাকে ভজহরি বলে ধরে নিয়ে খুব তোয়াজ করছিল। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। তবে ওর কথার প্যাঁচেই ওকে ফেলেছি। ঘুরে-ঘুরে এখন শ্যামাচরণকে খুঁজে হয়রান হচ্ছে।'

শুনে শিবেনের ভারী রাগ হল। তা হলে এই পিস্তলটা আসল পিস্তল নয়! আর ওই লোকটাও নয় ভজহরি! আর তার এত কষ্টের থিসিসটা হল ছাইভস্ম! রাগ হলে শিবেনের আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। আর কাণ্ডজ্ঞান হারালে শিবেন যা তা সব কাণ্ড করে ফেলে। আজও করল। বাগানের এখানে সেখানে ফেলা ভগ্নস্তূপের ইটপাটকেল পড়ে আছে। তারই একটা কুড়িয়ে নিয়ে শিবেন ধাঁই করে জানলার লোকটাকে লক্ষ্য করে সজোরে ছুড়ে মারল। 'আঁক' করে একটা আর্তনাদের শব্দ শোনা গেল। তারপর একটু তফাতে থেকেও শিবেন লোকটার পড়ে যাওয়ার শব্দ পেল।

ঢ্যাঙা লোকটা বিদ্যুতের গতিতে ফিরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ চোঁ-চোঁ দৌড়তে শুরু করল। কিন্তু শিবেনের রাগ হলে সে আর মানুষ থাকে না। থিসিস আর পিস্তল দুটোই ফেলে দিয়ে সে আর-একখানা আধলা কুড়িয়ে নিয়ে লোকটার পিছু ধাওয়া করল। ফটকের কাছাকাছি শিবেনের দ্বিতীয় ঢিলটা অবশ্য জায়গামতো লাগল না। তবে লোকটা পালাতে পারল না। হঠাৎ জনাদুই শক্তসমর্থ লোক কোথা থেকে এসে জাপটে ধরে পেড়ে ফেলল লোকটাকে।

বাইরের এসব গন্ডগোল পানিঘরে পৌঁছল না। সেখানে তখন এক আশ্চর্য শিসের শব্দে বাতাসে অপার্থিব কাঁপন বয়ে যাচ্ছে।

পাঁচু বিভোর হয়ে শুনছে। দু-চোখে বইছে জলের ধারা। অনেকক্ষণ শিস দেওয়ার পর হিজিবিজি থামল।

পাঁচু হাত বাড়িয়ে হিজিবিজিকে একটু ছুঁল। তারপর বলল, 'তুমি বড় ভালো লোক! তুমি বড় ভালো লোক!'